ঐতিহাসিক কিশোর উপন্যাস

দক্ষিণারঞ্জন বসু

শৈব্যা পুস্তকালয় ● ৮/১-সি, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট কলিকাতা-১২

পাপা পিতু ও বুবু জ্যেঠুকে

হট যাও হার্মাদ

যুদ্ধ দেখতে খুবই ভালো লাগে কমলের।

না, শুধু দেখতে নয়, লড়াই করতেও কমল কখনো পিছপা হয় না। যেখানে লড়াই করা সে প্রয়োজন মনে করে, সে লড়ে যায়।

এরই মধ্যে অনেক লড়াই করতে হয়েছে কমলকে। এইতো সেদিনও দাদার সঙ্গে তার বেশ এক হাত হয়ে গেল।

শেষ পর্যন্ত দাদাকে মেনে নিতে হয়েছে, একটু অন্যায়ের আশ্রয় নিয়েই সে হারিয়ে দিয়েছিল কমলকে—আসলে ওটা ড্র গেম।

প্রায়ই এমনিভাবে ছোট ভাইকে শান্ত রাখে নির্মল। কেউ তাকে অন্যায়ভাবে ঠকিয়ে দেবে, হারিয়ে দেবে কমল সহজে সেটি হতে দেবে না।

বাবার কাছ থেকে গল্প শুনে শুনে অদ্ভুত অদ্ভুত সব প্রশ্ন জাগে কমলের মনে। আজকাল ইতিহাসের গল্প শুনতে সে খুব ভালবাসে। রোজই একটা না একটা গল্প তাকে শুনিয়ে তবে বাবার নিস্তার তার হাত থেকে।

যেদিন বাবা বাইরে চলে যান কোনো কাজে কর্মে সেদিন কমল ব্যতিব্যস্ত করে তোলে তার মাকে একটি ইতিহাসের গল্প শোনাবার জন্যে।

আগে আগে মা-ই গল্প বলতেন, আর কমল শুনতো। কমল তখন শুনতে চাইতো বাঘ-ভালুকের গল্প, রাক্ষস-খোক্কসের গল্প, সিংহ মহারাজার গল্প। তারপর ক্রমে ক্রমে রূপকথার মজার মজার গল্পে তার মন গেল কিছুদিনের জন্যে। সে-সব গল্পই সে শুনতো তার মা'র কাছ থেকে কিন্তু রামায়ণ-মহাভারত ও পৌরাণিক সব কাহিনী

শুনতে শুনতে এখন তার বাতিক হয়ে দাঁড়িয়েছে দেশ বিদেশের রাজাদের, মন্ত্রী-সেনাপতিদের এবং নানা জাতির সব বর্ণনা শুনতে।

কাজেই ন'দশ বছরের ছেলে হলে হবে কি, কমল আজকাল ইতিহাসের ছাত্র। স্বয়ং বাবা কেদারেশ্বরবাবু তার ইতিহাসের শিক্ষক।

আগের রাতে ঘুম না আসা অবধি পর্তুগীজদের গল্প শুনছিল কমল তার বাবার মুখে। তাই মাঝে-মাঝেই স্বপ্ন দেখে ঘুমের ঘোরে চীৎকার করে বলছিল, ঐ যে ওরা আসছে, পর্তুগীজ দস্যুরা আসছে—হটাও ওদের, তাড়াও ওদের, মারো ওদের।

ঘুমের মধ্যেই যুদ্ধ করতে করতে কখন নিস্তেজ হয়ে পড়েছে, কমল তা' মোটে বুঝতেই পারেনি। ঘুম ভেঙেছে তার অনেক বেলায়। স্কুলে যেতে ছোট ছেলের দেরী হয়ে যাবে ভেবে মা তাকে ঘুম থেকে ডেকে তুলেছেন।

আগের দিন বাবার মুখে শোনা পর্তুগীজদের গল্পের জের পরের দিন সকাল বেলাতেও চলেছে। পড়তে বসবার কথাই কমলের ভুল হয়ে গিয়েছিল একেবারে। তাই নির্বিকার ভাবে সে অনেক বেলা পর্যন্ত শয্যায় পড়েছিল এবং পর্তুগীজদের কথাই ভাবছিল।

আর তা' নিয়ে এক রকম তোলপাড়ই পড়ে গিয়েছিল বাড়িতে। শেষটায় অবশ্য চুপ হতে হয়েছিল সবাইকেই। কারণ কমলই জিৎ-পার্টি। পর্তুগীজরা যুদ্ধে একেবারে হেরে ভূত।

সেখানেই মজার গল্প।

এবার কী হবে, সব ছেড়েছুড়ে না দিয়ে আর উপায় কী এখন!
ছোট্ট ছেলে কমল মাথা নেড়ে আপন মনেই বলে চলে।

কতো লোককে আর গুলী করে মারবে ওরা? ওদের গোলাগুলী সব ফুরিয়ে যাবে না?

একা একা এক মনে খেলতে খেলতে নিজেকে প্রশ্ন করে কমল। উত্তর তো সব আগে থেকেই ঠিক করা আছে।

কমলের খেলার মালমসলা সব বিচিত্র।

একটা সাবানের বাক্সের ঢাকনি। ছোটবড়ো কতগুলো শিশি-বোতল। গোটা কয়েক কৌটা। একখানি বড়ো চামচ। আর ঝাঁটার কাঠির অনেকগুলো টুকরো। এ ছাড়াও আরো কতো কী যে জড়ো করা হয়েছে, তা হিসেব করে বলা কঠিন।

সেই কখন থেকে খেলা হচ্ছে, এবার একটু লেখাপড়া নিয়ে বসো।

ঘরের কাজকর্ম শেষ করে মা এসে একবার বললেন ছোট ছেলে কমলকে।

বারে, আজ রবিবারেও বুঝি একটু বেশি করে খেলবো না। যাও মা, রাতে আজ অনেকক্ষণ পড়বো।

কমল খুব সহজভাবেই উত্তর দেয়।

বেশতো, এতোক্ষণ ধরে তো খেলা হলো। এবার খানিকক্ষণ পড়ে নাও, তারপর আবার খেলবে।

এটাতো মা পড়ারই খেলা হচ্ছে।

সে আবার কী কথা।

ও তা' তুমি জান না বুঝি। দাদা বলেছেন, ভারত স্বাধীন হয়েছে, কিন্তু গোয়া এখনো পরাধীন। গোয়াকে স্বাধীন করবার জন্যে এখন যুদ্ধ চলেছে। গোয়া যে আমাদের দেশের একটা অংশ

তা' তুমি ওসব দিয়ে কী করছো?

মা জিজ্ঞেস করেন।

বারে, তুমি কিছুই জান না। এই দেখছ না গোয়া।

সাবানের বাক্সের ঢাকনিটাকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে মা-কে বোঝাতে চায় কমল। দোতলার প্রকাণ্ড গোলাকার বারান্দাটা হলো পৃথিবী। তারই একটা বড়ো অংশকে সে ভারত বলে ধরে নিয়েছে। সেই ভারতের মধ্যে ঐ ছোট্ট সাবানের বাক্সের ঢাকনিটুকু পর্তুগীজদের জায়গা।

সেই ঢাকনিটার মধ্যে কতকগুলো শিশি-বোতল দাঁড়িয়ে। ছোট ছোট শিশিগুলো পুলিশ, বোতলগুলো সৈন্য। তার মধ্যেও আবার সেনাপতি, প্রধান সেনাপতির পার্থক্য। বড়ো চামচটাকে দাঁড় করিয়ে রেখে বলা হচ্ছে ওটা গোয়ার গভর্ণর।

কমলের মা মঞ্জুলা দেবী অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে দেখেন তাঁর ছেলের কাণ্ডকারখানা।

এই দেখো মা, হাজার হাজার নিরস্ত্র সত্যাগ্রহী কেমন করে এবার গোয়ায় ঢুকছে।

কতগুলো ঝাঁটার কাঠির টুকরোকে ছোট ছোট মাটির ঢেলার মধ্যে বসিয়ে সেগুলোকে কমল এগিয়ে দিচ্ছে জোড়ায় জোড়ায় গোয়ার দিকে। অর্থাৎ সাবানের বাক্সের ঢাকনির দিকে। ঐ কাঠির টুকরোগুলোই নাকি সত্যাগ্রহী।

গুড়ুম্, গুড়ুম্, গুড়ুম্।

সত্যাগ্রহীদের লক্ষ্য করে প্রচণ্ডভাবে গুলী চালায় পর্তুগীজ পুলিশ।

অনেক সত্যাগ্রহী গুলীর আঘাতের সঙ্গে সঙ্গেই প্রাণ হারায়: অনেকে আহত হয়েও বেঁচে থাকে।

আবার বহু সত্যাগ্রহীকে সীমান্ত পার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই

পর্তুগীজ পুলিশ গ্রেপ্তার করে নিয়ে যায় এবং বেপরোয়া ভাবে মারধর করার পর গোয়া থেকে বার করে দেয়।

এসব দৃশ্য কমল ঐ সব কাঠি আর শিশি-বোতলের সাহায্যে তার মাকে বুঝিয়ে দেয়।

মা-তো পাগলা ছেলের এসব কাণ্ডকারখানা দেখে হেসেই আকুল।

ওগো দেখে যাও তোমার ছেলের কাণ্ড।

বাড়ির কর্তাকে ডেকে সব দেখাতে চান কমলের মা।

কেদারেশ্বরবাবু তখন রবিবারের অবকাশ বিনোদন করছিলেন একখানা সন্থপ্রকাশিত ঐতিহাসিক উপন্যাসে মনোনিবেশ করে। গৃহিণীর ঐরকম আকস্মিক ডাকে চমক ভাঙে তাঁর। তড়িঘড়ি তিনি শয্যা ছেড়ে উঠে পড়েন।

কোথায়, কী হচ্ছে দেখি।

কর্তা ছুটে আসেন এই বলে।

বা রে, বাবাই তো কাল আমায় বলেছিলেন যে, পর্তুগীজরা দস্যুর জাত। ভারতের সমুদ্রে, চীনের সমুদ্রে জলদস্যুতা করে এরা কুখ্যাত হয়েছে। আর এ ভাবেই এরা সাড়ে চারশ' বছর আগে আমাদের দেশের গোয়া, দমন, দিউ নামের তিনটি ছোট ছোট জায়গা অধিকার করে নিয়েছে। ইংরেজ সারা ভারত ছেড়ে এবং ফরাসীরাও তাদের সব ঘাঁটি ছেড়ে চলে গেলেও পর্তুগীজরা কিছুতেই গোয়া ছেড়ে যেতে চাইছে না, একেবারে নাছোড়বান্দা। কিন্তু তাদেরকেও যেতেই হবে।

কমল বেশ জোরের সঙ্গেই এই কথা বলে। বাবাকে দেখে তার যেন আরো জোর বেড়ে যায়।

পর্তুগীজদের তাড়ানো হচ্ছে বুঝি।

ছেলেকে জিজ্ঞেস করেন কেদারেশ্বরবাবু।

তাড়ানো হবে না? ওরা যে ভীষণ নিষ্ঠুর। তা ছাড়া আমাদের দেশে ওরা চিরকাল থাকবে বুঝি।

কমল বিজ্ঞের মতোই বললে।

বলতো ওরা কতকাল আছে আমাদের দেশে?

বাবা জিজ্ঞেস করলেন ছেলেকে।

কেন, তুমিই তো কাল বললে, ইংরেজ-ফরাসীদের চেয়েও আগে ওরা সেই সাত সমুদ্দুর তের নদীর পার থেকে এসে এদেশে ঘাঁটি গেড়ে বসেছে। ইয়োরোপীয়দের মধ্যে পর্তুগীজরাই প্রথম বিদেশী অতিথি যারা ভারতে বাণিজ্য করতে এসে শাসক হয়ে উঠেছে।

কতকাল আগে পর্তুগীজরা প্রথম ভারতে এসেছিলেন তাই বলো।

সাড়ে চারশ' বছর আগে। তাইতো বলেছিলে, তাই না? আর বলেছিলে, একশ বছর পর্তুগীজরা ভারতের বন্দরে বন্দরে ওদের প্রভুত্ব বিস্তার করে চলে। শেষটায় সপ্তদশ শতাব্দীর শুরুতে ডাচদের মার খেয়ে ভারতের পশ্চিম উপকূলের তিনটি ঘাঁটি নিয়েই ওদের সন্তুষ্ট থাকতে হয়।

ঠিক বলেছো। ভেরি গুড। কিন্তু ভারতে কোথায় কোথায় ওদের ঘাঁটি, তা মনে আছে?

হ্যাঁ, সব মনে আছে। পশ্চিম ভারতের গোয়া, দমন, দিউ হলো আমাদের দেশে পর্তুগীজদের তিনটি ঘাঁটি। এর মধ্যে গোয়া হলো ওদের মূলকেন্দ্র। অর্থাৎ রাজধানী।

বাঃ চমৎকার। আচ্ছা, কাল পর্তুগীজদের কথা বলতে বলতে ভারতে ফরাসীরা যেসব জায়গাগুলো অধিকার করেছিল তার কথাও তোমাকে বলেছিলাম। সে জায়গাগুলোর নাম মনে আছে?

হ্যাঁ, পণ্ডিচেরী, মাহে, কারিকল আর আমাদের পশ্চিম বাঙলার চন্দননগর। ফরাসীরা ভালোয় ভালোয় এদেশের মাটি ছেড়ে চলে

গছে তাই ফ্রান্সের সঙ্গে আমাদের কোনো হাঙ্গামাই হয়নি। এই পর্তুগীজরাও তো চলে গেলে পারতো, তা'হলে আর আমাদের যুদ্ধ করতে হতো না। আমাদের প্রায় পঞ্চাশ কোটি লোকের সঙ্গে কী করে ওরা যুদ্ধ করতে সাহস পায় বাবা ?

কমল এবার নতুন প্রশ্ন তোলে বাবার কাছে।

সে অনেক বড়ো কথা। তুমি যখন বড়ো হবে তখন সে সব ভালো করে বুঝতে পারবে। এখন শুধু এটুকুই জেনে রাখো, পর্তুগাল ইয়োরোপের একটা অতি ছোট পিছিয়ে থাকা দেশ। পর্তুগাল যেমন ভারতের কয়েকটি ছোট ছোট অঞ্চলকে অধিকার করে আছে, তারা তেমনি বারবার তাদের স্বাধীনতাও হারিয়েছে।

কোন্ কোন্ দেশের কাছে ওরা হেরেছে বাবা ?

কমল খুব আগ্রহের সঙ্গে জানতে চায়। অনেকটা যেন আক্কেল দেখার মতো তার মনোভাব।

কেদারেশ্বরবাবুও সেটা বুঝতে পেরে তেমনি ভাবেই কমলের প্রশ্নের উত্তর দেন।

বলেন, বুঝলে বাবা, যারা অন্যের স্বাধীনতা কেড়ে নেয় তাদের স্বাধীনতাও যে মাঝে মাঝে বিপন্ন হবে, তাতে আর আশ্চর্য কি ? একালের কথা নয়, সাড়ে বারোশ' বছর আগে আরবরা গিয়ে পর্তুগাল জয় করে নিয়েছিল। সাড়ে তিন শ' বছরেরও বেশী কাল এই আরবদের দাসত্ব করতে হয়েছে পর্তুগীজদের।

তাই নাকি ?

কমল অবাক হয়ে শুনে।

কেদারেশ্বরবাবু খুব সংক্ষেপে নৌ-অভিযানের সব বিবরণটা জানিয়ে দেন ছেলেকে। বলেন, বিলাসী পর্তুগীজ রাজকুমার প্রিন্স হেনরীর উৎসাহে একজন দুঃসাহসী নাবিক সমুদ্রের বুকে নেমে পড়ে চারদিকে নতুন নতুন আবিষ্কারের উদ্দেশ্যে, ব্যবসা-বাণিজ্যের

প্রসার ঘটাতে এবং সাম্রাজ্য স্থাপনের দিকে লক্ষ্য রেখে। প্রায় পাঁচশ' বছর আগে সে প্রয়াস শুরু হয় পর্তুগালে। এতে তারা অনেকটা সাফল্যও লাভ করে। কিন্তু সেই সাফল্যের শতাব্দীতেই পাশের দেশ স্পেন হঠাৎ পর্তুগালের সিংহাসন অধিকার করে বসে।

স্পেনও কি অনেকদিন রাজত্ব করেছে পর্তুগালে?

অবাক্ হয়ে শুনতে শুনতে হঠাৎ কমল জিজ্ঞেস করে।

না, খুব বেশি দিন নয়, বছর ষাট পর পর্তুগীজরা তাদের স্বাধীনতা ফিরে পায় স্পেনের কাছ থেকে, তবে তারা যেসব উপনিবেশ স্থাপন করেছিল এদিক সেদিকে তার প্রায় সবগুলিই তাদের হাতছাড়া হয়ে যায় ঐ কয় বছরে।

খুব হয়েছে। বেশ ভালো হয়েছে।

আক্কেল দেখে কমল। স্পেন যে পর্তুগালকে এভাবে শায়েস্তা করেছে তাতে খুবই খুশি সে। কিন্তু আর কোনো দেশের হাতে ঐ দেশটা ভালো করে নাস্তানাবুদ হয়েছে কিনা সেটাই এখন তার জানার ইচ্ছে। তাই সে জিজ্ঞেস করে, আচ্ছা বাবা, স্পেনের হাত থেকে মুক্তি পাবার পর থেকেই কি একটানা স্বাধীন রয়েছে পর্তুগাল?

না, না, মোটেই না। শ' দেড়েক বছরেরও কিছু বেশি আগে নেপোলিয়ান তাঁর বিরাট ফরাসী বাহিনী নিয়ে এক রকম প্রায় পিষেই ফেলেছিলেন পর্তুগালকে।

বল কি বাবা, সত্যি সত্যি পিষে ফেলেছিলেন? তা'হলে তো বেশ ভালোই হতো।

সত্যি তাই। তাড়াতাড়ি আত্মসমর্পণ করে কোনোরকমে সে যাত্রায় দেশের লোকগুলোকে বাঁচায় পর্তুগীজ সরকার।

কতকাল ফরাসী শাসনে থাকতে হয় ওদের?

হ্যাঁ, তা একশ' বছরের বেশিই হবে নিশ্চয়। ইংরেজদের সাহায্য

নিয়ে অতি কষ্টে স্বদেশের মাটি থেকে বিদেশী ফরাসী শক্তিকে হটিয়ে দিতে সেবার সমর্থ হয়েছিল পর্তুগাল। তারই কিছুকাল আগে আততায়ীর হাতে হঠাৎ নিহত হয়েছিলেন পর্তুগালের রাজা দ্বিতীয় ম্যানুয়েল।

বাঃ। ওরা নিজেরাই নিজেদের রাজাকে মেরে ফেললে?

রাজা যদি অত্যাচারী হয়, কিম্বা যদি অকর্মণ্য হয় তা'হলে তো প্রজারা ক্ষেপে উঠবেই একদিন না একদিন। ক্ষেপে উঠে হয় রাজাকে মেরে ফেলবে, নয় তাড়িয়ে দেবে—এমনি একটা না একটা কিছু হবেই।

কিন্তু রাজাকে মেরে ফেলার পর কী অবস্থা হলো পর্তুগালের? ফরাসীদের তাড়িয়ে ওদেশটা কি ইংরেজরা নিয়ে নিলো?

না, তা অবশ্য নেয়নি। পর্তুগাল স্বাধীনই আছে সেই থেকে অর্থাৎ একটানা গত একশ' পঞ্চাশ বছর ধরে। তবে বিশ শতকের প্রথম ভাগে ইংরেজদের এবং পরে আমেরিকারও লেজুড় হয়েই থাকতে হচ্ছে তাকে।

সেটা আবার কী ব্যাপার?

তা' এখন তোমায় কী করে বুঝাবো তাই ভাবছি।

বলোই না তুমি, আমি ঠিক বুঝতে পারবো।

জোর করেই সব কিছু বুঝে নিতে চায় কমল, এমনি সে নাছোড়বান্দা।

বেশ, শোনো তা'হলে। পর্তুগাল থেকে ইংরেজদের সাহায্যে যখন ফরাসীদের হটিয়ে দেওয়া হলো তার বছর তিন বাদেই ইয়োরোপে একটা ভয়ংকর রকমের যুদ্ধ বেধে যায়। প্রধানতঃ ইংরেজ আর জার্মানদের মধ্যে যুদ্ধটা শুরু হলেও পৃথিবীর প্রধান প্রধান সব দেশই তাতে জড়িয়ে পড়ে। এর আগে এতো বড়ো যুদ্ধ আর হয়নি কখনো। সে জন্যেই একে বলা হয়ে থাকে প্রথম

মহাযুদ্ধ এবং সে যুদ্ধে পর্তুগাল তার বন্ধু ইংরেজকে পুরোপুরি সাহায্য করেছিল।

একেই লেজুড় বলছো তুমি?

ঠিক তাই। ইংরেজরা রাগ করতে পারে এমন কিছুই কখনো করে না পর্তুগাল। প্রথম মহাযুদ্ধ শেষ হবার বছর কুড়ি পর আরো একটা ভয়াবহ যুদ্ধ বেধে গিয়েছিল পৃথিবীতে। সেটাকে বলা হয় দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ।

তখন কি করেছিল পর্তুগাল?

সেবার অবশ্য সে একটা চালাকি খেলেছিল। যুদ্ধে কোনো পক্ষেই যোগ না দিয়ে চুটিয়ে ব্যবসা করেছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধটা আরম্ভ করেছিল জার্মানীর হিটলার। তাঁর বিরুদ্ধে ছিল মুসোলিনীর ইতালী ছাড়া প্রায় গোটা ইয়োরোপ এবং আমেরিকা। পর্তুগাল তার শাসনব্যবস্থাকে মজবুত করবার জন্যে হিটলারের চেলা-চামুণ্ডাদের সাহায্য নিয়েছিল, পরামর্শ নিয়েছিল। কাজেই পুরানো বন্ধু ইংরেজদের পক্ষে গেলে নতুন মিত্র জার্মানী যে চটে যাবে! আবার পুরোপুরি প্রত্যক্ষভাবে ওদিকে গেলেও বিপদ। তাই কোনো দিকে না ভিড়ে দু'দিকেই যুদ্ধের সাজসরঞ্জাম এবং অন্যান্য জিনিসপত্র বিক্রি করে প্রচুর অর্থ উপায় করেছে পর্তুগাল। তারপর জার্মানী কাত হয়ে পড়লে, তার পতন ঘটলে সে একেবারে পুরোদমে মহরম-মহরম শুরু করে দেয় ইংরেজ আর আমেরিকানদের সঙ্গে!

ভারি চালাক তো দেখছি পর্তুগীজরা!

বিস্ময় প্রকাশ করে কমল দস্যু হলেও পর্তুগীজদের বুদ্ধির পরিচয় পেয়ে।

তাইতো। পাঁচ-ছয় বছরের যুদ্ধে প্রচুর অর্থও রোজগার করা গেল, আবার মুরুব্বিও লাভ হলো। এখন পর্তুগালের এক নম্বর মুরুব্বি হলো আমেরিকা এবং দু' নম্বর ইংল্যাণ্ড।

সে জন্যেই পর্তুগালের এত তেজ এখন। বুঝতে পেরেছি, খুটির জোরই মেড়ার জোর। তা'হলেও আমাদের দেশ থেকে ওদের আমরা হটিয়ে দেবোই। ঐ ছাখো, আমাদের দেশের সব মানুষ চারদিক থেকে ওদের কেমন ঘিরে ফেলেছে।

এই বলে কমল তার প্ল্যানটা বুঝিয়ে দিতে চায় তার বাবাকে।

ঠিক তখনই কমলের দাদা নির্মল এসে ডাকে কেদারেশ্বর বাবুকে। বাবা, একটা অঙ্ক আমি কিছুতেই মেলাতে পারছি না। তুমি একটু বুঝিয়ে দিয়ে যাও না।

আচ্ছা কমল, তোমার গোয়া যুদ্ধ তুমি চালিয়ে যাও। পরে তোমার সঙ্গে এ নিয়ে আরো অনেক কথা হবে। এখন দাদাকে ওর অঙ্কটা একবার বুঝিয়ে দিয়ে আসি। দেখে আসি গোলমালটা কোথায়।

এই বলে কেদারেশ্বরবাবু যেই নির্মলের ঘরের দিকে যাবার উদ্যোগ করেছেন অমনি বাবার হাত ধরে টেনে ধরে কমল বলে ওঠে, আচ্ছা বাবা, মনে মনে আমিও একটা অঙ্ক কষে ফেলেছি। বলে দাও তো অঙ্কটা ঠিক হলো কিনা।

কী অঙ্ক সেটা আগে বলো, তবে তো!

ঐ যে তুমি বললে পর্তুগীজরা আরবদের অধীনে কাটিয়েছে সাড়ে তিনশ' বছর, তারপর স্পেনের অধীনে ষাট বছর এবং সবশেষে ফ্রান্সের শাসনে একশ' বছর। তা'হলে দেখা যাচ্ছে গোয়া-দমন-দিউকে সাড়ে চারশ' বছর চেপে রাখলেও পর্তুগালকে পাঁচশ' বছরেরও বেশি সময় পরদেশী বুটের তলায় কাটাতে হয়েছে।

রাইট, মাই বয়, কোয়াইট রাইট!

এই বলে কেদারেশ্বরবাবু পাশের ঘরে চলে গেলেন নির্মলের পড়ার ঘরে।

এবার একটু পড়তে যাও বাবা। দেখছ না দাদা কেমন সুন্দর লেখাপড়া করছে। বাবাকে কেমন করে সে টেনে নিয়ে গেল অঙ্ক বুঝিয়ে দেবার জন্যে।

মা মঞ্জুলা দেবীর কথায় প্রথমটা যেন একটু লজ্জা পেল কমল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই তার জিভের ডগায় একটা উত্তর এসে গেল। মাকে সে পরিষ্কার জানিয়ে দিলে, বারে, বাবা যে এইমাত্র আমায় অঙ্কে রাইট দিয়ে গেলেন। মুখে মুখে কী রকম বড় একখানা যোগ অঙ্ক কষে দিলাম। কোথায় তার জন্যে আমায় বাহবা দেবে, তা'নয় গালমন্দ করছ।

আহা, কী আমার বাহাদুর ছেলে রে। ক্লাস ফাইভের ছাত্র, যোগ অঙ্কে রাইট করে আবার দেমাক। লোকে কি বলবে? যাও, একটু বইপত্র নিয়ে বসো গিয়ে। তা' নইলে রেজাল্ট এবার একদম খারাপ হয়ে যাবে।

এবার মায়ের কথায় একটু বেশি লজ্জা পায় কমল। একটু ভয়ও পায়। গত বছরের মতো এ বছরও তাকে ফার্স্ট হতে হবে। তা' না হলে যে ভীষণ দুঃখ পেতে হবে তাকে। তাই টুক করে সে তার পড়ার ঘরে ঢুকে যায়, সেখানে গিয়ে যে বইখানা সে হাতে নিয়ে বসে সেখানা ইতিহাসের বই। সেই মুহূর্তে ইতিহাসই যে তার ছোট মনটিকে পুরোপুরি অধিকার করে নিয়েছিল।

ইতিহাসের পৃষ্ঠা ওল্টাতে ওল্টাতে এক জায়গায় এসে দৃষ্টি ধরে রাখতে বাধ্য হলো কমল।

পর্তুগীজ বণিকদের ভারতে আগমন—এ অধ্যায়টি পেয়ে সে বেশ উত্তেজিত হয়ে উঠলো। পড়তে আরম্ভ করলো একেবারে গোড়া থেকে।

বাবার মুখে কত গল্প শুনেছে কমল পর্তুগীজদের সম্পর্কে। ওদের দস্যুতার কথা, লুঠতরাজের কথা, নিষ্ঠুরতার কথা। ইতিহাসের

কয়েকটি পাতা এক নিঃশ্বাসে পড়ে নিয়ে পর্তুগীজ বণিকদের অমানুষিকতার আরো অনেক বিষয়ই সে জেনে ফেলে। জেনে ভেতরে ভেতরে সে গর্জে ওঠে। শুধু তাই নয়, হঠাৎ পড়ার ঘর থেকে কমল ছুটে বেরিয়ে আসে।

না, কিছুতেই আর এই সব বিদেশীদের ভারতের পুণ্য মাটিতে থাকতে দেওয়া চলবে না। ওদের আমরা আমাদের দেশ থেকে হটিয়ে দেবোই।

মনে মনে এই কথা বলে পকেট থেকে তার নকল পিস্তলটা বার করে নেয় কমল। তারপর তাক কষে 'গুড়ুম্' করে এক গুলী ছোড়ে। একটা নয়, পর পর অনেকগুলি 'গুড়ুম্' 'গুড়ুম্' শব্দে কমলের বাবা-মা দু'জনেই দু'দিক থেকে এসে দাঁড়িয়ে পড়েন ঘটনাস্থলে।

ঘটনাস্থল মানে যুদ্ধস্থল। গোয়া সমরাঙ্গন। অর্থাৎ যেখানে জেনারেল কমল ঘটক পর্তুগীজদের সমানে সাবাড় করে চলেছে, সে জায়গা। আরো পরিষ্কার করে বলা চলে, ওদের দোতলায় বারান্দার পৃথিবীতে ভারতের বুকে একবিন্দু পর্তুগীজ গোয়া।

কোদারেশ্বরবাবু সেখানে এসেই দেখেন অনেক পর্তুগীজ সৈন্য এরই মধ্যে ধরাশায়ী হয়ে পড়েছে কমলের পিস্তলের গুলীতে।

এ কি করেছ কমল? এতগুলি লোককে মেরে ফেললে?

বাবা খুব কৌতুহলের সঙ্গে জিজ্ঞেস করলেন শ্রীমান কমলকে।

মারবো না তো কি? নিষ্ঠুরতার প্রতিশোধ নিতে হবে না?

কাদের নিষ্ঠুরতা?

কেন, পর্তুগীজদের।

ওদের নিষ্ঠুরতার কথা কি জানো, বলতো।

কেন, সেই যে তুমি বলেছিলে, কে একজন গামা নাকি ভীষণ অত্যাচার করেছিলেন এ দেশের লোকদের ওপর।

ও তুমি ভাস্কো-দা-গামার কথা বলছো! হ্যাঁ, ঠিকই বলেছ,

ইনিই প্রথম পর্তুগীজ, যিনি ভারতে আসেন ব্যবসা বাণিজ্য করার উদ্দেশ্য নিয়ে। কিন্তু সুযোগ বুঝে এদেশে পর্তুগীজ রাজ্যের ভিত্তি প্রতিষ্ঠাও করে যান তিনিই।

ইনিই তো কয়েক শ' মুসলমান তীর্থযাত্রীকে সাগরের জলে ডুবিয়ে ইঁদুরের মতো মেরে ফেলেছিলেন, তাই না বাবা ?

হ্যাঁ, ঠিক বলেছ। সেই কবে তোমায় সে গল্প করেছি, ঠিক মনে আছে তো তোমার! ভেরি গুড।

বারে, মনে থাকবে না? সেই যে তুমি বলেছিলে, জাহাজের ফাঁক দিয়ে এই শত শত লোকের মৃত্যু দেখে এই গামা নাকি লাফিয়ে উঠেছিলেন আনন্দে! আনন্দে নাকি চীৎকার করেছিলেন। সেই ভয়ংকর নিষ্ঠুরতার কথা কি ভুল হতে পারে কখনো ?

তাইতো, ঠিকই বলেছ। এর পরেও আর যারা এদের রাজ্য শাসনের ভার নিতে এসেছেন এদেশে, তাঁদের প্রায় সকলেই চরম নিষ্ঠুরতার পরিচয় দিয়েছেন। পর্তুগীজ গভর্ণর আলমিদা এদেশের কতো লোককে যে কচুকাটা করেছিলেন তার হিসেবনিকেশ নেই। মানুষের চোখ উপড়ে ফেলতে তাঁর খুব আনন্দ হতো, এ কি ভাবা যায় ?

উঃ কী ভয়ংকর ব্যাপার! কিন্তু বাবা, যাঁর কাছ থেকে ভালো ব্যবহার পাওয়া যায় তাঁর সঙ্গে লোকে অন্যায় আচরণ করে কী ভাবে ?

তাদেরই তো দুর্বৃত্ত বলে। যে সব পর্তুগীজ আমাদের দেশে বাণিজ্য করতে এসে রাজ্য কায়েম করে বসেছিল তাদের প্রায় সবাই ছিল তেমনি চরিত্রের মানুষ। এদের স্বভাব-দুর্বৃত্ত বললেও বাড়িয়ে বলা হয় না।

হ্যাঁ বাবা, তাই। একটু আগেই আমি ভাস্‌কো-দা-গামার কথা পড়ছিলাম আমার ইতিহাস বইতে।

কী পড়ছিলে বলতো।

সে ১৪৯৮ খ্রীষ্টাব্দের কথা। আফ্রিকা মহাদেশের দক্ষিণে উত্তমাশা অন্তরীপ। সেই উত্তমাশা অন্তরীপের পথ ধরে ভাস্‌কো-দা-গামা দক্ষিণ ভারতের পশ্চিম কূলবর্তী কালিকট বন্দরে সদলবলে এসে পৌঁছুলে তিনি 'জামোরিণ'-এর কাছ থেকে বেশ সাদর ও উদার অভ্যর্থনাই লাভ করেছিলেন। কিন্তু যেভাবে তিনি সেই সদয় ব্যবহারের প্রতিদান দিয়েছিলেন তা' ভাবা যায় না।

কিন্তু কে এই 'জামোরিণ' যিনি বিদেশী অতিথিকে সম্ভাষণে মুগ্ধ করতে গিয়ে হতাশ হয়েছেন ?

ছোট ছেলের ইতিহাসের বিদ্যে এইভাবে পরীক্ষা করতে চান কেদারেশ্বরবাবু। কতটা মন দিয়ে সে পর্তুগীজদের গল্প পড়েছে তাও যাচাই করতে চান এমনি করে।

উত্তরে বাহবা দিতেই হয় ছেলেকে। কালিকটের রাজাকেই তখনকার দিনে বলা হতো 'জামোরিণ'।

কমলের মুখ থেকে এ জবাব পাবার সঙ্গে সঙ্গেই, নতুন প্রশ্ন তোলেন কেদারেশ্বরবাবু।

তিনি জিজ্ঞেস করলেন, আচ্ছা বেশ, নতুন বিদেশী অতিথি ভাস্‌কো-দা-গামা কী এমন অন্যায় আচরণ করেছিলেন কালিকটের সেই রাজার বিরুদ্ধে একটু আগেই তুমি যার কঠোর সমালোচনা করলে ?

বাঃ, যে 'জারোরিণ'-এর উদারতায় ভাস্‌কো-দা-গামা কালিকট বন্দরে সদলে নামতে পেরেছিলেন তাঁরই পাঁচজন নিরীহ প্রজাকে ধরে নিয়ে গিয়ে তাদের ওপর তিনি অকথ্য অত্যাচার চালিয়েছিলেন, এটা কি অন্যায় নয় ? সে থেকেই তো পর্তুগীজদের সঙ্গে 'জামোরিণ'-এর শত্রুতার সূত্রপাত।

ভেরি নাইস। কিন্তু যে কথা তোমায় বলেছিলাম, ভাস্‌কো-দা-গামা একাই শুধু নন, তাঁর পরে যেসব পর্তুগীজ বণিক বা শাসক

এদেশে এসেছেন তাঁদের প্রায় সবাই ছিলেন ঐ একই রকম চরিত্রের মানুষ। শত্রু-মিত্র বিচার না করে যে-কোনো লোকের ওপরেই যখন তখন অত্যাচার চালিয়ে ওরা খুব আনন্দ পেতেন।

হ্যাঁ, আমার ইতিহাস বইতেও তেমনি কথাই পড়ছিলাম। তুমি বলো না বাবা একবার তাঁদের কথা। তাহলে আমার সবটা বেশ জানা হয়ে যাবে এবং খুবই ভালো রকম মনেও থেকে যাবে।

কিন্তু তুমি যে এখন লড়াইতে মেতে আছ বাপধন! পিস্তল উঁচিয়ে রেখে কি আর ইতিহাসের গল্প শোনা চলে?

বাবার খোঁচায় লজ্জা পেয়ে হেসে ফেলে কমল। তাড়াতাড়ি হাতের পিস্তলটা পকেটে পুরে রাখে। তারপর বলে, বেশ বলো এবার পর্তুগীজদের গল্প। আমি এখন আর জেনারেল কমল ঘটক নই, ব্যস, তা'হলেই তো হলো।

ঠিক তাই, কোনো জেনারেলের কাছে নয়, আমি আমার ছেলে শ্রীমান কমলের কাছেই পর্তুগীজ লুঠেরা ও শাসকদের ভয়াবহ নিষ্ঠুরতার গল্প করছি। তবে এ কথাও ঠিক, যাদের তুমি শত্রু মনে করবে এবং যাদের সঙ্গে তোমার যুদ্ধ করতে হবে তাদের সমস্ত খবর তোমায় রাখতে হবে। শত্রুর চরিত্র ভালো করে জানা থাকলেই তাকে সহজে কি করে ঘায়েল করা যাবে ভেবেচিন্তে সে কৌশল স্থির করা যায়।

আমিও সেজন্যেই পর্তুগীজদের ইতিহাস ভালো করে জানতে চাই। ভারতের মাটি থেকে ওদের সমূলে উৎখাত করতেই হবে। তাইতো আমার শ্লোগান ঠিক করে নিয়েছি—হট যাও হার্মাদ।

তা তো দেখতেই পাচ্ছি। সে জন্যেই তো নিজেদের বাড়িতে এত বড়ো একটা যুদ্ধ তুমি আরম্ভ করে দিয়েছ। আর 'হট যাও হার্মাদ' শ্লোগানটিও তোমার খুবই সুন্দর হয়েছে। কিন্তু হার্মাদ কথাটার মানে তোমার জানা আছে তো? আমার যেন মনে হয় একদিন

তোমায় স্পেনের আর্মাডার গল্প শুনিয়েছিলাম। মনে পড়ে তোমার ?

বাবার কথায় আরেক বার হেসে ফেলতে হয় কমলকে। তবে সে হাসি চেপে রেখেই সে উত্তর দেয়, যাই বলো যে যুদ্ধ শুরু হয়েছে তা' থেকে এবার আর নিষ্কৃতি নেই পর্তুগীজদের। এ যুদ্ধে ভারত ছেড়ে ওদের যেতেই হবে। আমেরিকা বা ইংল্যাণ্ড কোনো বন্ধুই এবার ওদের রক্ষা করতে পারবে না।

বহুৎ আচ্ছা। কিন্তু এবার তোমার শ্লোগানের অর্থটা আমায় সংক্ষেপে বুঝিয়ে দাও। আসলে হার্মাদ কথাটার মানেটা এবং তার পিছনের গল্পটা তোমার জানা আছে কিনা সেটাই আমি বুঝতে চাই।

হ্যাঁ বাবা, তা' আমার জানা আছে। জলদস্যুদের হার্মাদ বলে এবং কথাটা যে এসেছে 'আর্মাডা' থেকে সে গল্প তুমি আমায় মাসখানেক আগে এক রবিবারের দুপুরে শুয়ে শুয়ে ভারি সুন্দর করে বুঝিয়ে দিয়েছিলেম।

বেশ, বলতো সেই গল্পটি, দেখি পুরোপুরি তোমার মনে আছে কিনা ?

নিশ্চয়ই মনে আছে বলে স্প্যানিশ আর্মাডার গল্প গড়গড় করে বলে যেতে লাগলো কমল। রাণী এলিজাবেথের সময়ে ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে স্পেনের রাজা দ্বিতীয় ফিলিফস ১২৯টি জাহাজ বোঝাই ১৯ হাজার সৈন্য, ৮ হাজার নাবিক, ২ হাজার কামান ও অর্ধলক্ষ লোকের ছ'মাসের খাদ্যাদি নিয়ে ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করেছিল, কিন্তু এক প্রবল ঝড়ে ওদের জাহাজগুলি সব ছিন্নভিন্ন হয়ে গিয়েছিল। আরও গোয়ায় এমন যুদ্ধের ঝড় তুলবো পর্তুগীজরা পালিয়ে যেতে পথ পাবে না।

সাবাস জেনারেল, এই তো চাই। ইংরেজ ভারত ছেড়ে গেছে,

ফরাসীরা বিদায় হয়েছে আর পর্তুগীজরা ভারতের মাটি আঁকড়ে পড়ে থাকবে, তা হতে পারে না। সভ্যতা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ইংরেজ ও ফরাসীদের বলবার মতো অবদান রয়েছে, কিন্তু এই পর্তুগীজদের পরিচয় তো শুধু নির্মমতায় ও লুটতরাজে। তাই এদেশ থেকে ওদের তাড়িয়ে দিতে তোমরা যে উঠেপড়ে লেগেছ সেটা খুবই ভালো কথা।

আচ্ছা বাবা, ভাস্‌কো-দা-গামার ঠিক পরেই কোন্ অভিযাত্রী যেন এসেছিলেন আমাদের দেশে সুদূর পর্তুগাল থেকে? ইতিহাসে পড়ছিলাম সে ভদ্রলোক দক্ষিণ ভারতের রাজনীতিতে দলাদলি রেষারেষি বাড়িয়ে দিয়ে তাঁর সুযোগ নিতে খুব তৎপর হয়ে উঠে ছিলেন। অনেক হাঙ্গামার তিনিই সূত্রপাত করেছিলেন। কিছুতেই তাঁর নামটা এখন আমার মনে পড়ছে না। বড্ড কঠিন নাম।

প্রায় সব পর্তুগীজের নামই বেশ শক্ত। তুমি বোধ হয় পেড্রো আলভারেজ ক্যাব্রাল-এর কথা বলছো।

হ্যাঁ, হ্যাঁ ঠিক এই নামটিই আমার মনে আসছিল না। ভাস্‌কো দা-গামার নাম-ডাক শুনে, তাঁর অসামান্য সাফল্যের প্রশংসায় মুগ্ধ হয়ে দু'বছরের মধ্যেই তিনি পাড়ি জমালেন ভারতের পথে। ভাস্‌কো-দা-গামার আবিষ্কৃত নতুন পথ ধরেই তিনি ভারতের দিকে রওনা হয়েছিলেন।

কিন্তু তুমি জানো কি কত লোকজন নিয়ে তিনি যাত্রা করেছিলেন?

জানি বৈকি।

বাবার প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গে জবাব দেয় কমল। বলে, বারো শ' পর্তুগীজ ও প্রচুর পরিমাণে বাণিজ্যের জিনিস ভর্তি করে তেরোখানা জাহাজ নিয়ে পেড্রো আলভারেজ ক্যাব্রালও ভাস্‌কো-দা-গামার মতোই কালিকট বন্দরে এসে হাজির হয়েছিলেন।

বলতো সেটা কোন্ বছরের কথা ?

সেটা একেবারে ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম বছরের ঘটনা।

থ্যাঙ্ক ইউ, ওয়াণ্ডারফুল।

আনন্দে অধীর হয়ে কমলকে কোলে তুলে নিয়ে আদর করতে থাকেন কেদারেশ্বরবাবু। আর সেই আদরে অস্থির হয়ে কমল কেবলই বলতে থাকে, বারে মাত্র ঘণ্টাখানেক আগেই যে আমি পড়ছিলুম পেড্রো আলভারেজের কথা। তা' মনে থাকবে না ?

বেশ বেশ। কিন্তু বলতো জামোরিণের সঙ্গে এই লোকটির কেমন সম্পর্ক ছিল ?

কমলকে এই প্রশ্ন জিজ্ঞেস করে পাশের একটা চেয়ারে বসে পড়েন কেদারেশ্বরবাবু।

সম্পর্কটা প্রথম প্রথম বোধ হয় খারাপ ছিল না। কারণ জামোরিণ ভাস্কো-দা-গামাকে যেমন কালিকটে নামতে বাধা দেননি, বরং সসম্মানে সম্বর্ধনা জানিয়েছেন, ঠিক তেমনি পেড্রো আলভারেজ ক্যাব্রাল-এর বেলাতেও তিনি কোনোরূপ অনুদারতার পরিচয় দেননি। কাজেই প্রথমেই অসদ্ভাবেরও কোনো কারণ ঘটেনি।

কিন্তু প্রথমে না হলেও পরে অসদ্ভাব ঘটেছিল দু'পক্ষের মধ্যে, এটাই তো তুমি বলতে চাও। সে বিবাদ-বিসম্বাদের কী কারণ, তা জানো কিছু ?

হ্যাঁ, জানি বৈকি। একটু আগেই তো তা' পড়ছিলাম।

বেশ, জানিয়ে দাও দেখি আমাকে সেই ঝগড়ার কাহিনী।

ঝগড়া নয় বাবা, রীতিমত সংঘর্ষ। আর সে সংঘর্ষ চলেছে ক্রমাগত অনেক দিন ধরে।

কেদারেশ্বরবাবুর ভ্রম সবিনয়ে সংশোধন করে দেয় কমল এই বলে।

বাপের কিন্তু তাতে সুবিধেই হয় ছেলেকে পাল্টা প্রশ্ন করতে।

তিনি জিজ্ঞেস করেন, কী নিয়ে সংঘর্ষ বেঁধেছিল জামোরিণ আর পর্তুগীজ পেড্রোর মধ্যে তাও তুমি পড়েছ বাবা? পড়ে থাকলে আমায় বলো দেখি সেই গল্প।

পড়েছি বৈকি, আমার ইতিহাস বইতে পর্তুগীজদের সম্বন্ধে যা কিছু লেখা আছে তার সবটাই পড়েছি। তা' পড়েই জেনেছি, পেড্রো আলভারেজ ক্যাব্রাল লোকটি ছিলেন অত্যন্ত ধূর্ত। দলবল নিয়ে কালিকট বন্দরে নেমেই তিনি মতলব আঁটলেন সেখানকার সমস্ত ব্যবসা-বাণিজ্যে পুরোপুরি পর্তুগীজদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করবেন বলে।

কী রকম?

ব্যাপারটা ছেলের কাছে একটু বিস্তারিত ভাবেই জানতে চাইলেন কেদারেশ্বরবাবু।

চুপ করে একটু শোনোই না, এবার আমি সে কথাই বলছি। পর্তুগাল থেকে প্রচুর পরিমাণে যে সমস্ত মালপত্র নিয়ে এসেছিল পেড্রো আলভারেজের দল সে সব বিক্রী করে তারা এতো অর্থ লাভ করলো যে তাতে সীমা ছাড়িয়ে গেল তাদের লোভের মাত্রা।

কেমন?

যে বন্দরে এতো বিপুল পরিমাণ টাকার বেচাকেনা চলে সেখান থেকে যদি সমস্ত প্রতিযোগীদের হটিয়ে দেওয়া যায় তা'হলে এই বিরাট দেশের বাজার অধিকার করে ফেলে পর্তুগালকে কয়েক বছরের মধ্যেই একটা ধনী দেশে পরিণত করা যাবে, হঠাৎ এমনি একটা চিন্তায় পেয়ে বসলো পেড্রো আলভারেজকে।

তারপর?

তারপর আর কি, যে আরব-বণিকরা ছিল কালিকট বন্দরের সমৃদ্ধির এবং এতো নাম ডাকের মূল কারণ তাদের তাড়িয়ে দেবার জন্যে পর্তুগীজরা উঠেপড়ে লাগলে জামোরিণ বাধ্য হয়েই তাতে

বাধা দিতে অগ্রসর হলেন। আর সেই থেকেই নতুন করে শুরু হলো জামোরিণের বিরুদ্ধে পর্তুগীজদের শত্রুতা।

শেষ পর্যন্ত কী রূপ নিয়েছিল সেই শত্রুতা?

সে বড়ো বিশ্রী ব্যাপার বাবা। আগেই তো বলেছি, ভারি ধূর্ত প্রকৃতির লোক ছিলেন পেড্রো আলভারেজ ক্যাব্রাল।

সে ধূর্ততার প্রমাণ কোথায়?

জামোরিণকে শায়েস্তা করার জন্যে পেড্রো আলভারেজ প্রথম থেকেই নানা রকম চক্রান্তের কথা ভাবছিলেন।

কি রকম?

তিনি দেখলেন, দক্ষিণ ভারতের রাজনীতিতে জামোরিণকে যদি কোনোরকমে একঘরে করে ফেলা যায় এবং অন্য রাজাদের দ্বারা সব সময়ে তাঁকে বিব্রত রাখা যায় তা'হলেই তারা নির্বিবাদে কালিকটে কর্তৃত্ব করতে পারবে।

সাংঘাতিক পরিকল্পনা তো!

হ্যাঁ, তাই বাবা। কতো নীচতা ও নোংরামির যে পরিচয় দিয়েছিলেন পেড্রো আলভারেজ তা' ভাবা যায় না।

তার প্রমাণ দাও কিছু।

বলছি। যেমনি তিনি জানতে পারলেন যে কোচিনের রাজা ও কালিকটের জামোরিণের মধ্যে সদ্ভাব নেই অমনি আলভারেজ গোপনে গোপনে কোচিন-রাজের সঙ্গে হাত মিলিয়ে ফেললেন জামোরিণকে জব্দ করার জন্যে।

কি ফল দাঁড়ালো তাতে?

দক্ষিণ ভারতের দুই প্রধানের মধ্যে এবং অন্য সব রাজার মধ্যে প্রকাশ্য দ্বন্দ্ব বাধিয়ে দিয়ে পর্তুগীজরা একদিকে যেমন সব রকম সুযোগ গ্রহণে তৎপর হয়ে উঠলো, আরেকদিকে তেমনি তারা আরব-বণিকদের অতিষ্ঠ করে তুললো তাদের বাণিজ্য জাহাজগুলি

একের পর এক লুণ্ঠন করে। তা' নিয়েই সংঘর্ষ বেধে গিয়েছিল জামোরিণের ঐ পর্তুগীজদের সঙ্গে।

কতকাল চালু ছিল সে অবস্থা ?

তা' বৎসরাধিক কাল তো হবেই। কারণ বইতে পড়েছিলাম, পেড্রো আলভারেজের পর ভাস্কো-দা-গামা দ্বিতীয়বার সদলে ভারতের মাটিতে এসে অবতরণ করেন। সেবার তিনি আসেন আরো বড়ো উদ্দেশ্য নিয়ে।

কী এমন বড়ো উদ্দেশ্য হতে পারে ?

পুত্রের জ্ঞানের বহর পরীক্ষা করতে কেদারেশ্বরবাবু প্রশ্নের পর প্রশ্ন তোলেন। কিন্তু কোনো প্রশ্নেই ঘায়েল করা যায় না কমলকে।

শেষ প্রশ্নের সে জবাব দেয়, উদ্দেশ্য প্রাচুর্যের দেশ ভারতকে দীর্ঘকাল ধরে লুঠ করার জন্যে এদেশে পর্তুগীজ সাম্রাজের বনিয়াদ প্রতিষ্ঠা করে যাওয়া। প্রকৃতপক্ষে তাই ছিল ভাস্কো-দা-গামার দ্বিতীয় বার ভারতে আসার লক্ষ্য।

ঠিক বলেছো কমল। সেটা পনের শ' দু' সালের কথা। জামোরিণকে জব্দ করার জন্যে পেড্রো আলভারেজ ক্যাব্রাল কোচিনের রাজার সঙ্গে যে বন্ধুত্বের সম্পর্ক স্থাপন করেছিলেন তারই পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করেছিলেন ভাস্কো-দা-গামা। তিনি সেই বন্ধুত্বের সুযোগ নিয়েই কোচিন এবং ক্যানানোরে দু'টি পর্তুগীজ বাণিজ্যকুঠি প্রতিষ্ঠা করেন। আসলে তাই হলো ভারতে পর্তুগীজ সাম্রাজ্যের গোড়াপত্তন।

এ তো ইতিহাসেরই কথা, কমল বললে, ঐ সময় থেকেই তো প্রত্যেক বছর পর্তুগাল থেকে একজন করে শাসনকর্তা ভারতে আসতেন এখানকার পর্তুগীজ বাণিজ্যকেন্দ্রগুলি দেখাশুনা করার জন্যে। পড়ছিলাম, এঁদের প্রায় প্রত্যেকেই নাকি ছিলেন ভয়ংকর রকম নিষ্ঠুর মানুষ। অবশ্য এর বেশি আর কোনো পরিচয় পাইনি

তাঁদের। আমাদের নীচের ক্লাসের ইতিহাস বইতে কতটুকুই বা লেখা থাকে। একদিনেই সব পড়া হয়ে যায়।

ঠিক আছে, আজই বিকেলে আমি তাঁদের কয়েক জনের কথা তোমায় বেশ ভালো করে বুঝিয়ে বলবো। এখন চলো তোমার এই রণাঙ্গন থেকে কিছুক্ষণের জন্যে বিদায় নেওয়া যাক। সৈন্য-সামন্তদেরও তো খাওয়া-দাওয়াটা কোনো রকমে সেরে নিতে হয়। ওদিকে তোমার মা আবার আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছেন।

বেশ চলো তা'হলে।

কমল উঠে পড়ে বাবার কথায় এবং যাবার সময় বাবাকে বলে যায়, বিকেলে বলতে হবে কিন্তু পর্তুগীজদের সব গল্প।

বিকেলে হঠাৎ আবার গুডুম্, গুডুম্ আওয়াজ। যাকে বলে একেবারে আকাশ কাঁপানো শব্দ।

কেদারেশ্বরবাবু চমকে ওঠেন সেই অতর্কিত আওয়াজে। দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর তিনি একটু বিশ্রাম করছিলেন। শুয়ে শুয়ে খবরের কাগজ পড়তে পড়তে কখন ঘুমিয়ে পড়েছেন কিছুই তাঁর খেয়াল নেই। গভীর ঘুম। এদিকে বিকেল প্রায় কাবার হয়ে এসেছে। কখন বাবা জাগবেন, তারপর চা খেতে খেতে পর্তুগীজদের দস্যুতা ও দুষ্কর্মের গল্প বলবেন, তারজন্যে আর অপেক্ষা করা সম্ভব নয় জেনারেল কমল ঘটকের পক্ষে।

তাই হয়ে যাক আরেক হাত লড়াই, তেমনি সিদ্ধান্তই নিয়ে ফেলেছে কমল।

সিদ্ধান্তের সঙ্গে সঙ্গেই অর্ডার—ফায়ার!

ব্যস, অমনি গুডুম্, গুডুম্ শব্দে চারিদিক একেবারে মুখরিত।

বিরামহীন এমনি গুলী বর্ষণে হতচকিত হয়ে কমলের মা, দাদা, বুচি পিসি সবাই সেখানে এসে উপস্থিত। কলতলায় বাসন মাজা ফেলে রেখে বাচ্চুও ছুটে এসেছে সেখানে।

বাচ্চুকে দেখে কমল ভারি খুশি। বাড়ির চাকর হলেও কমল তাকে ডাকে ক্যাপ্টেন বাচ্চু বলে। তারই দেওয়া উপাধি ক্যাপ্টেন। তাকে সে শুধু এই মিলিটারী উপাধিই দেয়নি, তার হাতে অস্ত্রও তুলে দিয়েছে—তাকে একটা রিভলভার উপহার দিয়েছে পর্তুগীজ দস্যুদের সঙ্গে লড়াই করার জন্যে।

কোথায়, তোমার রিভলভারটা কোথায় রেখে এলে?

ক্যাপ্টেনকে খালি হাতে দেখেই খানিকটা বিরক্তির সঙ্গে প্রশ্ন করে জেনারেল কমল। নিজের হাতের পিস্তলটি তখনো সে উঁচিয়েই রেখেছে। শুধু তাই নয়, বাচ্চুর উত্তরের জন্যে অপেক্ষা না করে আরেক দফা গুলী চালিয়ে যায় সে—গুড়ুম, গুড়ুম, গুড়ুম্। শব্দের সঙ্গে সঙ্গে চারদিক ধোঁয়ায় ছেয়ে যায়।

ঠিক ঐ সময়েই বুচি পিসী বলছিল কমলের মাকে, দেখেছ বৌদি, তোমার সেনাপতি ছেলের কাণ্ড—দমাদ্দম গুলী মেরে গণ্ডা গণ্ডা পর্তুগীজ সৈন্যকে কেমন সে ধরাশায়ী করে চলেছে। সত্যি, এ এক দেখার মতো ব্যাপার!

সে কথার খেই ধরেই গুরুগম্ভীর স্বরে দাদা বলে উঠলো, হবে না, কমল যে আমাদের বাড়ির জেনারেল চৌধুরী। জয়ন্ত চৌধুরীর হায়দরাবাদ বিজয়ের কাহিনী শোনবার পর থেকেই তার সখ জেগেছে সেনাপতি হবার। সুযোগ একটা সে পেয়ে গেল একটু বড়ো হতেই। গোয়া বিজয়ের যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল সেই জেনারেল চৌধুরীরই নেতৃত্বে, আর তারই দেখাদেখি নিজের বাড়িতে পর্তুগীজ ভারতের মানচিত্র তৈরী করে নিয়ে সেখান থেকে পর্তুগীজ বিতাড়নের নকল অভিযান চালিয়ে যাচ্ছে জেনারেল কমল ঘটক।

নকল নয়, রিয়্যাল।

দাদার কথাটা কানে যেতেই একটু উত্তেজিত হয়ে ওঠে কমল। তার লড়াইটা যে একটা নকল লড়াই, একথা সে মানতে যাবে কেন? হাতে কলমেই সে প্রমাণ করে দেয় যে রীতিমতো একটা ভয়াবহ যুদ্ধই সে আরম্ভ করে দিয়েছে। ভারতের মাটি থেকে বিদেশী সাম্রাজ্যের শেষ চিহ্নটুকু মুছে না ফেলা পর্যন্ত কমলের যে শান্তি নেই। এদেশ থেকে হার্মাদদের এবার হটে যেতে হবেই।

কমলের কথা শেষ হলেই তাই ভারি জোর একটা আওয়াজে বাড়িটা কেঁপে ওঠে। সেই আওয়াজেই ঘুম ভেঙ্গে যায় কেদারেশ্বর বাবুর। তিনি ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে আসেন আবার কোথায় কি ঘটলো তা' দেখতে।

বাইরে বেরিয়ে এসে যেই দেখলেন ছোট ছেলে তার পকেটে পিস্তলটা গুঁজে রাখছে, অমনি তার আর বুঝতে বাকি রইলো না যে এসবই তাঁর ছেলে শ্রীমান কমলের কাণ্ড—'পর্তুগীজ, ভারত ছাড়' অভিযানের, তার 'হট যাও হার্মাদ' শ্লোগানের ব্যাপার।

বীর সেনাপতি ছেলের কাছে চলে এলেন কেদারেশ্বরবাবু। স্ত্রী, বড়ো ছেলে ও বোন এখনো সেখানে দাঁড়িয়ে। সবার সামনেই গৃহকর্তা বললেন কমলকে লক্ষ্য করে, বাবা রে বাবা, তোমার লড়াইতে আমাদের যে মারা পড়ার উপক্রম। একটু ঘুমুতেও দেবে না ছুটির দিনের দুপুর বেলায়? কি সুন্দর ঘুমটা এসেছিল কাগজ পড়তে পড়তে। সব দিলে মাটি করে।

এখনো দুপুর কোথায় বাবা, সন্ধ্যে হয়ে এলো যে। ঐ ছাখো না একবার পশ্চিম দিকে চেয়ে। সূর্য যে অস্ত যেতে চলেছে, দেখছো না?

আকাশের দিকে দৃষ্টি ছড়িয়ে দিয়ে চোখ নামিয়ে হেসে ফেললেন কেদারেশ্বরবাবু। হাসতে হাসতে বললেন, খুব ঠকিয়েছ

বাবা, তা'হলেও আমি যে কথাটা বলেছিলাম তা' বোধ হয় ভুলে যাওনি।

কি কথা ?

সেই যে বলেছিলাম, যুদ্ধে নামার আগে শত্রুপক্ষের সমস্ত খুঁটি-নাটি এবং ইতিহাসটা ভালো করে জেনে নেওয়া দরকার।

হ্যাঁ, তুমি বলেছিলে বটে এবং আমিও অনেকক্ষণ ধরে সে জন্যে অপেক্ষা করছিলাম। কিন্তু যে ভাবে তুমি নাক ডাকিয়ে ঘুমুচ্ছিলে তাতে আমি কি করে আশা করবো যে এতো শীগ্‌গির তুমি জেগে উঠবে ?

এই রকম যুদ্ধ পরিবেশে নিশ্চিন্তে ঘুমুবে কার সাধ্যি। কি বলবো তোমার শেষ গুলীটা আমায় বধ করতে না পারলেও তার প্রচণ্ড শব্দটা আমায় এক রকম বধির করে ফেলেছে।

ছেলেকে বললেন কেদারেশ্বরবাবু।

যাই হোক ভালোই হয়েছে। তুমি জেগে উঠেছ, এদিকে ছুটে এসে যুদ্ধের অবস্থা নিজের চোখেই দেখতে পাচ্ছ। আমরা যে জিতবো সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই আমার। তবু পর্তুগীজদের ইতিহাস ভালো করে জেনে নিতে বাধা কি ? এবার জিতে গেলেও আবার তো কখনো ওদের সঙ্গে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়তে পারি। তখন সেটা হয়তো কাজে লাগবে।

ওয়াণ্ডারফুল মাই ডিয়ার বয়।

আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে বলে ফেলেন কেদারেশ্বরবাবু।

তা' হলে পরিষ্কার করে বলো এবার পর্তুগীজদের কোন্ কথা আমায় জানাতে চাও ?

এই বলে কমল মানচিত্রের বাইরে চলে এসে বাবাকে নিয়ে মুখোমুখি দুই চেয়ারে গিয়ে বসে পড়ে।

ছেলের কাণ্ড দেখে কেদারেশ্বরবাবু না হেসে পারেন না।

কমলের মা আর বুচি পিসী সে দৃশ্য দেখে ভেতরে চলে গেলে বাপ-ছেলেতে গল্প শুরু হয়ে যায় রীতিমত দীর্ঘ গল্প। নির্মলও সে গল্প একটু শুনে এক ফাঁকে মুচকি হেসে চলে যায় তার নিজের ঘরে, একটু বাদে সে খেলতে বেরুবে।

দাদা খেলাধুলো এবং পড়াশুনো দুটোতেই যেমন সমান ভাবে মত্ত, গত ক'দিন ধরে কমল ঠিক তার উল্টো পরিচয় দিয়ে চলেছে। অন্য কোনো দিকেই এখন আর তার ভ্রূক্ষেপ নেই। তার একমাত্র কথা, ওলন্দাজ, ইংরেজ, ফরাসী সবাই পালিয়েছে —এবার পর্তুগীজদের আমরা ভারতের মাটি থেকে তাড়াবো, তবে শান্তি! বার বার সে কেবলি তার সেই পুরনো শ্লোগানই দিয়ে চলেছে। সেই এক ধ্বনি—হট যাও হার্মাদ!

সেটাই তো কথা, কেদারেশ্বরবাবু বললেন, তুমি আজ ভারতের মাটি থেকে পর্তুগীজদের হটাতে চাইছো। বেশতো, খুবই ভালো কিন্তু প্রায় চারশো বছর আগে কী ভাবে ওদের বাঙলা দেশ থেকে হটিয়ে দেওয়া হয়েছিল সেটা তো প্রথমে জেনে নেওয়া দরকার।

বেশ, বলো সে গল্প। ভেরি ইন্টারেষ্টিং!

বাবা ভারি খুশি ছোট ছেলের গল্প শোনার আগ্রহ দেখে। তিনি দিল্লীর বাদশাহ আকবরের আমলে কিভাবে বাঙলায় এসে বিদেশী পর্তুগীজরা ঘাঁটি বেঁধেছিল সে গল্প বেশ রসিয়ে রসিয়ে রং চড়িয়ে বলতে আরম্ভ করলেন।

কর্তা বললেন, জানো বাবা কমল, মুঘল সম্রাট আকবর ছিলেন উদার প্রকৃতির মানুষ। চতুর পর্তুগীজরা সেই বাদশাহের কাছ থেকে কোনো রকমে একটি ফর্মাণ আদায় করে নিয়েছিল। সেই

ফর্মাণ নিয়েই পর্তুগীজরা ব্যবসা-বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে হুগলী জেলায় সপ্তগ্রামে এসে উপস্থিত হলো।

সেকালের সপ্তগ্রাম বন্দরের কথা বলছো বাবা?

হ্যাঁ, যাকে সোজা কথায় সাতগাঁও-ও বলা হয়ে থাকে, সেই সপ্তগ্রাম। শ্রীচৈতন্যদেবের গল্প করতে করতে তোমাদের দু'ভাইকে এই সপ্তগ্রামের দুই জমিদার ভ্রাতার কাহিনী বলেছিলাম। মনে আছে তোমার?

হ্যাঁ বাবা, মনে পড়ছে। সপ্তগ্রামের রাজা হিরণ্য দাস ও রাজা গোবর্ধন দাসের কথা বলছিলে তুমি। নগর সরকার তাঁদের দু' ভাইকে রাজা ও মজুমদার উপাধি দিয়েছিল। রাজা গোবর্ধনের ছেলেই তো ভক্ত রঘুনাথ যিনি ধন ঐশ্বর্য ও সংসার ত্যাগ করে শ্রীচৈতন্যের আশ্রয় নিয়েছিলেন, তাই না বাবা?

ঠিক তাই।

সেখানে এসে পর্তুগীজরা বুঝি লুটপাট আরম্ভ করলো, জবর-দখল করাই তো ওদের স্বভাব। ইতিহাসে ওদের সে পরিচয়টাই মূল পরিচয় হয়ে আছে।

ইতিহাসের একজন তৃষ্ণার্ত পাঠক হিসেবেই একথা বললে জেনারেল ঘটক।

কেদারেশ্বরবাবু উত্তরে জানালেন, তা' যতোই সত্য হোক না কেন, এও ঠিক সাতগাঁওয়ে ভীড় না জমিয়ে পর্তুগীজরা নদী-তীরবর্তী হুগলীতে আস্তে আস্তে নতুন বাণিজ্য কেন্দ্র গড়ে তুলতে উদ্যোগী হলো। এর পেছনে যে একটা মতলব ছিল। তাতে কোনো সন্দেহ নাই।

কিভাবে তারা আরম্ভ করেছিল সে কাজ?

জিজ্ঞেসা করলো কমল। সে প্রশ্ন করতে গিয়েই তার মনে পড়ে গেল, তার বাবাই তাদের বলেছিলেন, ভক্ত রঘুনাথের পিতার

কাছ থেকেই ভাগীরথী তীরে কিছু জমি কিনে গোলাঘাটে পর্তুগীজরা একটি দুর্গ নির্মাণ করেছিল। সেটা ঠিক কিনা তাও কমল জানতে চাইলো বাবার কাছে।

সেন্ট পার্সেন্ট রাইট। সেই গোলাঘাটের দুর্গকে কেন্দ্র করেই তো হুগলী শহরের পত্তন হয়েছিল। ঐ হুগলীতে গিয়েই পর্তুগীজরা বড়ো বড়ো বাড়িঘর সব তৈরি করে ফেললো। একটা বন্দরের জন্যে যা কিছু প্রয়োজন দেখতে দেখতে সবই সেখানে তৈরি হয়ে গেল। নতুন বন্দরে দিনের পর দিন ভীড় বেড়ে চললো, তারপর এক সময়ে দেখা গেল সপ্তগ্রামের চেয়ে হুগলী বন্দরের নামটাই বেশি ছড়িয়ে পড়েছে চারদিকে।

তারপর ?

তারপর আর কি, হুগলীর সমৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পর্তুগীজদের দুর্বুদ্ধিও ক্রমে ক্রমে প্রকাশ পেতে লাগলো। ঐ যে একটু আগে ওদের একটা মতলবের কথা বলছিলাম না, সেই মতলবটা জানাজানি হয়ে গেল।

কি রকম ?

শোনো সেই মজার ব্যাপার। হুগলী বন্দরের নাম যখন চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছে তখন স্বাভাবিক ভাবেই সারা বাঙলা, এমনকি বাঙলা দেশের বাইরে থেকেও দলে দলে সব লোক বাণিজ্য করতে এসে ঘাঁটি তৈরি করে বসে যেতে লাগলো সেই নতুন বন্দর শহর হুগলীতে। লাভের অঙ্ক বেড়ে চলতে থাকলে পর্তুগীজরা হুগলী নদীর তীরে ব্যাণ্ডেলেও আরেকটি বন্দর তৈরি করে নেয় এবং সেখানে একটা মস্ত গীর্জাও নির্মাণ করে ১৫৯৯ সালে যেটা বাঙলার সবচেয়ে পুরনো গীর্জা।

সে তো ভালোই।

হ্যাঁ, ভালো তো বটেই। তবে বাণিজ্যিক ও ব্যবসায়ীদের

বিরাট সমাবেশ দেখে পর্তুগীজরা আর লোভ সামলাতে পারছিল না। বিশেষ করে তখন হুগলীতে তামাকের বাজারটা খুব জোর জমে উঠেছিল। বলতে গেলে একেবারে একচেটিয়া বাজার। সুযোগ বুঝে তারা বাঙালী তথা ভারতীয় কারবারীদের ওপর খুব বেশি করে বাণিজ্য-শুল্ক বসিয়ে দিল। অর্থাৎ তাদের কাছ থেকে উচ্চ হারে তোলা তুলতে শুরু করলো। এভাবে পর্তুগীজরা অনেক টাকা রোজগার করতে লাগলো। সে টাকায় যেমনি তারা যথেচ্ছ আমোদ স্ফূর্তি করতে লাগলো তেমনি প্রচুর অর্থ তাদের দেশেও পাঠাতে থাকলো।

এও তো এক রকমের লুণ্ঠনই বাবা!

অনেকটা বিস্ময়ের সঙ্গেই মন্তব্য করলো কমল।

হ্যাঁ, তা বৈকি। এ একেবারে স্রেফ লুণ্ঠন। তবে এই লুণ্ঠন-প্রবৃত্তি এবং আরো কতকগুলো অনাচার বাঙলায় পর্তুগীজদের পতন ঘনিয়ে আনলো। সে পতন যে অতো তাড়াতাড়ি হয়ে উঠবে তা' মোটেই অনুমান করতে পারেনি পর্তুগীজরা।

কি রকম?

সমস্ত ব্যাপারটা ভালো করে বুঝে নিতে চায় কমল।

সে কথাই বলছি এবার। যে টাকাটা শুল্ক হিসেবে রাষ্ট্রীয় কোষাগারে অর্থাৎ দিল্লীর কোষাগারে যাবার কথা সেটা পর্তুগীজরা তোলা হিসেবে হুগলী বন্দর থেকে তুলে নিচ্ছে, এ সংবাদে রীতিমতো উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলেন সম্রাট শাহ্‌জাহান।

ফলে যুদ্ধ বেধে গেল, তাই না?

না, ঠিক তখনই যুদ্ধ বাধে নি। আকবরের পর তাঁর আরামপ্রিয় পুত্র জাহাঙ্গীরের শাসনকালটায় পর্তুগীজরা কেবলি তাদের প্রতিপত্তি বাড়িয়ে চলছিল বাঙলাদেশে। নর-নারী নির্বিশেষে সবার ওপর অত্যাচার করতে, হিন্দুদের মন্দির ভাঙতে, মক্কাযাত্রীদের

ও ভারতীয় বণিকদের জাহাজ লুঠ করতে তারা একটুও ভাবতো না। সম্রাট জাহাঙ্গীর সেদিকে অনেকটা উদাসীন থাকলেও তাঁর মৃত্যুর পর শাহ্‌জাহান সিংহাসনে বসেই বিদেশী বোম্বেটে পর্তুগীজদের অন্যায় কার্যকলাপ লক্ষ্য করতে লাগলেন। ওদের ওপর গোপনে নজর রাখার এমন ব্যবস্থা করলেন যাতে ওরা মোটেই কিছু টের না পেতে পারে।

তাদের কোন্ কোন্ অন্যায় কাজ ধরতে পেরেছিলেন সম্রাট ?

সে অনেক ব্যাপার। নিজেদের যথেষ্ট শক্তিশালী মনে করে ঐ পর্তুগীজ দস্যুরা ঘৃণ্য দাস-ব্যবসা শুরু করে দিয়েছিল হুগলীতে। বহু গরীব অসহায় হিন্দু-মুসলমানের শিশু-সন্তানকে ওরা চুরি করে নিয়ে গিয়ে হুগলীর বাজারে বিক্রি করে দিতো। অনেক বালক-বালিকা চুরি করে ইয়োরোপে নিয়ে গিয়ে ওরা বেশি দামে বিক্রি করতো। এক একটা গ্রামে লুটপাট করে নিরীহ লোকদের বাড়িঘর জ্বালিয়ে দিতো।

কি সাংঘাতিক।

শুধু এই নয়, আরো আছে। স্পর্ধা পর্তুগীজদের এতোটা বেড়ে গিয়েছিল যে, স্বয়ং সম্রাজ্ঞী মমতাজ মহলের দুই বাঁদীকে পর্যন্ত বন্দী করতে সাহসী হয়েছিল ওরা। কি রকম বেপরোয়া হয়ে উঠেছিল ওরা, এ থেকেই বুঝতে পারছো।

এ যে ভাবতেই পারা যায় না বাবা। একদল বিদেশী এসে দেশের সম্রাট ও সরকারকে এমনিভাবে কি করে অপমান করতে সাহস পেতে পারে তা' যে কল্পনা করাও অসম্ভব।

ঠিক তাই।

ছোট্ট ছেলের কথা এই বলে মেনে নিলেন কেদারেশ্বরবাবু। তারপর বললেন, ওখানে থেমে গেলেও বাঙলার পর্তুগীজদের জীবনে বোধ হয় অতো শীগ্‌গির চরম বিপর্যয় নেমে আসতো না।

কিন্তু নিয়তিকে কে ঠেকাবে? তাই ঐ বিদেশী দস্যুরা ধরাকে সরা জ্ঞানে সীমাহীন বাড়াবাড়ি শুরু করে দিল।

শেষ পর্যন্ত তা' হলে বোধহয় পর্তুগীজদের প্রচণ্ডতম ধাক্কা খেতে হলো সম্রাটের বাহিনীর কাছে, তাই না?

অনেকটা তাই।

ছেলের অনুমানের সমর্থনে মন্তব্য করলেন বাবা। বললেন, যখন জানা গেল, পর্তুগীজ পাদ্রীরা নানা রকম লোভ দেখিয়ে দলে দলে হিন্দু-মুসলমানকে খৃষ্টান ধর্মে ধর্মান্তরিত করছে, তখন আর নীরব থাকা সম্ভব হলো না সম্রাটের পক্ষে। ক্ষেপে গিয়ে তিনি বাঙলার শাসক কাশিম আলি খানকে হুকুম দিলেন খুব কড়া হাতে এমন ভাবে পর্তুগীজদের দমন করার জন্যে, যাতে ওরা আর মাথা তুলতে না পারে।

বাঃ, এই তো চাই!

ভারি খুশি জেনারেল কমল এই শুনে। কিন্তু কিভাবে ঐ দস্যুদের শায়েস্তা করা হলো সেটাই তো তার আসল জানবার বিষয়। সে তথ্যই সে গভীর আগ্রহ নিয়ে জানতে চাইলো তার বাবার কাছে। জিজ্ঞেস করলো, সম্রাটের হুকুম পেয়ে কি করলেন বাঙলার শাসক কাশিম আলি?

তারপরে তো আর কথা নেই। সম্রাটের নির্দেশের সঙ্গে সঙ্গেই হুকুম তামিলের সব ব্যবস্থা হয়ে গেল। এর মধ্যে নবাগত ইংরেজ বণিকদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায়ও পর্তুগীজরা বেশ কাবু হয়ে পড়ছিল। ঠিক সে সময়েই সুযোগ বুঝে কাশিম আলির ছেলে হঠাৎ একদিন ঝাঁপিয়ে পড়লো হুগলীর ওপর বিরাট সরকারী ফৌজ নিয়ে।

নিশ্চয় এবার জোর যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল দু'পক্ষে।

তা তো নিশ্চয়ই। আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত ছিল পর্তুগীজরা,

তা ছাড়া আধুনিক যুদ্ধবিদ্যায়ও ওরা ছিল পারদর্শী। তা' হলেও তিন মাসের মধ্যেই অনেক প্রাণহানির পর এবং প্রায় চার হাজার পর্তুগীজকে বন্দী করে আগ্রায় পাঠিয়ে দেবার পর বাঙলার মাটি থেকে চিরতরে নির্মূল হতে হয়েছিল ঐ বোম্বেটে হার্মাদ পর্তুগীজদের। সম্রাট শাহ্‌জাহান বাস্তবিকই বাঙালীর পরম উপকার করেছিলেন বাঙলাকে পর্তুগীজদের কবল্‌ থেকে মুক্ত করে।

বাঃ চমৎকার! ঠিক তেমনি ভাবেই এবার আমরা দস্যু পর্তুগীজদের ভারতের মাটি থেকেও নির্মূল করতে বদ্ধপরিকর। জয়হিন্দ্‌!

এই বলে আনন্দে লাফিয়ে উঠে এদিক ওদিক একবার তাকিয়ে নিয়ে পকেট থেকে বার করেই পিস্তলটা আরেকবার উঁচিয়ে ধরে জেনারেল কমল ঘটক।

পিস্তলটা শুধু উঁচিয়ে ধরাই নয়, 'ফায়ার' অর্ডার দিয়েই কমল নিজেই সঙ্গে সঙ্গে পিস্তল ছুঁড়তে শুরু করে।

সে মুহূর্তেই বুচি পিসী এক ঘর থেকে আরেক ঘরে যাচ্ছিলেন সেখান দিয়ে। ভয়ে জড়সড় হয়ে তিনি বলে উঠলেন, আর যাই করো বাবা, অনাথা অবলাদের প্রাণ নিও না, যখন তখন গুলীগোলা ছুঁড়ে মা-মাসী-পিসীকে জীবনে মেরো না। এই নিরীহ মানুষগুলোর কথা মনে রেখ যেন।

এ কি কথা বলছ বুচি পিসী, ভারতীয় সৈনিকের কাছে নারী এবং শিশুবধের চেয়ে বড়ো পাপ নেই। নারীর মর্যাদা রক্ষার জন্যে কতো ভারতীয় জওয়ান যে প্রাণ দিয়েছে তার কোনো ঠিক নেই। কাজেই তোমরা মেয়েরা নিশ্চিন্ত থাকতে পারো।

তা'ছাড়া তোমরা তো আর আমাদের শত্রুপক্ষের লোক নও, আমাদেরই দলের লোক। যুদ্ধের সময় নিজেদের দলের লোককে কেউ গুলী-গোলা ছুঁড়ে মারে কখনো ? তা'হলে আবার তোমাদের ভয়টা কিসের শুনি।

বারে, ভয় থাকবে না, সারাদিন ধরে এরকম ভয়াবহ যুদ্ধ চললে মেয়েরা কখনো নিশ্চিন্তে থাকতে পারে ? শত্রুপক্ষের গুলীতে কিংবা বোমায়ও তো আমরা মারা পড়তে পারি। সন্ধ্যা হয়ে গেল, এবার একটু থামবে তো।

দাঁড়াও, এখুনি থামছি। তার আগে আরো কয়েকটাকে সাবাড় করে নিই।

এই বলে বুচি পিসীকে তাড়াতাড়ি দূরে সরে যেতে বলে জেনারেল ঘটক যাতে তিনি ভয়ে ঘাবড়ে না যান।

গুলীর মুখে আরেক দফা আওয়াজ ওঠে—গুড়ুম, গুড়ুম, গুড়ুম। প্রচণ্ড শব্দ।

ক্যাপ্টেন বাচ্চু গেল কোথায় ? ও ব্যাটাকে নিয়ে আর পারা গেল না। পুরোদমে যখন যুদ্ধ চলছে তখন কোনো সৈন্যকে যদি রণক্ষেত্রে খুঁজে না পাওয়া যায় সেটা যে ঘোরতর অপরাধ সে কথাটা ওকে ভালো করে বুঝিয়ে দেওয়া দরকার। মিলটারী ডিসিপ্লিন কেউ ভাঙলে তার যে কোর্ট মার্শাল হবে এবং কোর্ট মার্শাল বিচারের শাস্তি যে ভয়ংকর, সে কথা ক্যাপ্টেন বাচ্চু বোধ হয় জানেই না ! ওকে সেটা জানিয়ে দিলেই মনে ভয় ঢুকে যাবে, আর কখনো যুদ্ধের সময় এ ভাবে ডুব মারবে না।

জেনারেল কমল ঘটক যখন আপন মনে এমনি ধারায় ভেবে চলছিল ঠিক তখনই অতর্কিতে কোথা থেকে বুটে বুট ঠুকে মিলিটারী কায়দায় একটা স্যালুট দিয়ে সামনে এসে দাঁড়ায় ক্যাপ্টেন বাচ্চু।

তারপর কপাল থেকে হাতটা নামিয়ে ক্যাপ্টেন সোজা হয়ে

দাঁড়িয়ে বলে, স্যার, ঐ দেখুন তিন-তিনটে গোরাকে এই মাত্র আমি দাক্ষিণ রণাঙ্গনে খতম করে এলুম। পর্তুগীজরা খুবই ভয় পেয়ে গেছে মনে হচ্ছে। যাকগে, অন্ধকার নেমে গেছে, এবার আজকের মতো ক্ষ্যান্ত দেওয়াই বোধ হয় ভালো।

বহুৎ আচ্ছা, আজ তা হলে এ অবধিই থাক, বাকী লড়াইটা আবার কাল সুর্যোদয়ে শুরু হবে। তবে একটা কথা মনে রাখবে ক্যাপ্টেন বাচ্চু, মিলিটারী আইনকানুন সব সময় মেনে চলবে বাপু। একটু এদিক ওদিক হলেই কিন্তু কোর্ট মার্শাল। 'পান থেকে চুন খসলে'ই ফাঁসি, বুঝলে। এতদিন ধরে সামরিক বিভাগে রয়েছ, সামরিক আইন ভালো করে জানো না, এ কেমন কথা ?

অতো সব আমি বুঝি না জেনারেল। আমি হুকুমের চাকর। হুজুরের হুকুম সব সময়েই আমি এক পায়ে হাজির। যখন যেমনি অর্ডার তখন তেমনি কাজ।

ব্যস, এইতো চাই। সাবাস ক্যাপ্টেন।

এই বলে বাচ্চুকে যখন বাহবা দিচ্ছিল কমল, মা তখন 'বেড়াল, বেড়াল' বলে ছুটতে ছুটতে সেখানে উপস্থিত। সেখানে মানে একেবারে রণাঙ্গনের মাঝখানে প্রায়।

কি হয়েছে মা, কি হয়েছে ?

মায়ের ছুটোছুটি দেখে আর চিৎকার শুনে জিজ্ঞেস করে কমল ? শত্রুপক্ষ নতুন কোনো ফ্রন্ট আবার খুলে বসলো কিনা সেটাই ওার ভয়।

কি হয়েছে দেখতে পেলে না হতচ্ছাড়া ছেলে ? তোদের দুই বীর সেপাইয়ের মাঝখান দিয়েই তো ওবাড়ির বেড়ালটা আমাদের রান্নাঘর থেকে রুই মাছের মুড়োটা মুখে নিয়ে দৌড়ে পালিয়ে গেল।

রাগে কাঁপতে কাঁপতে বললেন মঞ্জুলা দেবী। ক্ষেপে গিয়ে আরো বললেন, বেড়ালের হাত থেকে যারা নিজেদের রান্নাঘরটা

রক্ষা করতে পারে না, সেই সামান্য মুরদটুকু যাদের নেই তারা আবার বিদেশীদের সঙ্গে লড়াই করে জিতবে বলে বড়াই করে।

মায়ের রাগ দেখে জেনারেল কমল তো একেবারে হেসেই কুটপাট। হাসতে হাসতেই মাকে সে বললে, মা, তোমার রান্নাঘর থেকে অন্য বাড়ির বেড়াল এসে মাছের মুড়ো নিয়ে যাওয়ায় তুমি এমনি রেগে গেলে, আর কোথায় সাত সমুদ্র তের নদীর ওপারে পর্তুগাল, সেখান থেকে এসে পর্তুগীজরা আমাদের দেশের সব সোনাদানা ধনরত্ন নিয়ে যাচ্ছে শ' শ' বছর ধরে, তা' আর আমরা কতকাল সহ্য করবো বলো। বিদেশীরা যদি আমাদের সব কিছু এমনি করে লুটপাট করে নিয়ে না যেতো, আর আমরা যদি ঝগড়া-বিবাদ না করে মিলেমিশে সব সময় সজাগ থাকতে পারতাম, তা'হলে কি আর আমাদের দেশের অবস্থা কখনো এমন শোচনীয় হ'তো? না বেড়ালগুলো সাহস পেতো রান্নাঘর থেকে এমনিভাবে মাছের মুড়ো নিয়ে পালাতে?

যাও, আর পাকামি করতে হবে না। তাড়াতাড়ি এবার পড়তে বসো গিয়ে।

রাগ তখনো কমেনি মঞ্জুলা দেবীর, তাই কড়া কড়া কথা তিনি শুনিয়ে দেন ছোট ছেলেকে।

অমন করে তুমি বকছো কেন মা, দাদাবাবু তো ঠিকই বলেছেন।

জেনারেল কমলকে জোর সাপোর্ট দেয় ক্যাপ্টেন বাচ্চু। আরো বলে, তোমরা সব সময় দাদাবাবুকে কেবল পড়ার কথা বলো। ভালো করে না পড়লে, না জানলে অমন করে কি কথা বলা যায় কখনো? ইতিহাসের দেশী-বিদেশী সব কাহিনী আমাদের ছোট দাদাবাবুর একেবারে মুখস্থ। ওর মতো করে ওদের ক্লাসের আর কোনো ছেলেই এমন নির্ভুল ভাবে সাজিয়ে গুছিয়ে বলতে

পারবে না, এ আমি জোর গলায়ই বলতে পারি। ছোটদাদা বাবু পড়াশুনোয় ফাঁকিবাজ, এ অভিযোগ করা চলে না।

ঠিক বলেছিস বাচ্চু, আমি পড়াশুনোই যদি না করবো তা' হলে বছর বছর ফার্স্ট স্ট্যাণ্ড করছি কি করে। তবে এবার একটু ভাবনায়ই পড়েছি।

এই বলে একটু দম নিয়ে আবার বলতে শুরু করে জেনারেল কমল, পর্তুগীজদের এদেশ থেকে হটাতে গিয়ে বড্ড বেশি যুদ্ধে জড়িয়ে গেছি। তাতে পড়াশুনোর বেশ কিছুটা ক্ষতি হলো বৈকি। তবে গোয়া যুদ্ধের ওপর যদি একটা রচনা আসে তা'হলে পুরো নম্বর তাতে নিশ্চয় পাবো, একথা জোর করেই বলতে পারি।

দেখি কোথায় আমার বাহাদুর ছেলে? কার সঙ্গে অমন কেরামতির কথা হচ্ছে শুনি।

বাইরে থেকে একটু বেড়িয়ে এসে ঘরে ঢোকবার আগেই কমলের কণ্ঠস্বর শুনতে পাচ্ছিলেন কেদারেশ্বরবাবু এবং বৈঠকখানায় ঢুকতেই তাঁর চোখে পড়ে যায় দুই মূর্তিমান—কমলকুমার আর বাচ্চু।

মঞ্জুলা দেবী ততক্ষণে তাঁর কাজে চলে গেছেন।

কেদারেশ্বরবাবু বাচ্চুকে লক্ষ্য করেই প্রথমে বললেন, তোমার কোনো কাজকর্ম নেই বুঝি, তাই দাদাবাবুর সঙ্গে গল্প জুড়ে দিয়ে ওর পড়াশুনোটা ভণ্ডুল করে দিচ্ছ।

এযে এক ঢিলে দু'পাখি মারার ব্যাপার তা' ধরে ফেলতে একটুও দেরি হয়নি কমলের।

সঙ্গে সঙ্গেই সে তাই উত্তরে বলে, বাচ্চু আমার পড়াশুনো তো মোটেই ভণ্ডুল করেনি বাবা। কেন তুমি মিছিমিছি ওকে বকছো? শুধু শুধুই গালমন্দ করে ও বেচারাকে তুমি দুঃখ দিলে।

বারে, বাচ্চু আর তুমি গল্প করছিলে না এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে?

তা' অনেক কথা। অতো বলার সময় নেই। তবে কি জান বাবা, এই মাত্র আমি আজকের মতো লড়াই স্থগিত রাখার কথা ঘোষণা করেছি। আজ অনেকগুলো শত্রু সৈন্য নিপাত করেছি আমরা। আমাদের তরফের দু'চারটি সৈন্যের প্রাণহানি ঘটলেও পর্তুগীজদের মনোবল যে ক্রমশঃই ভেঙে পড়ছে তা' বোধ হয় কারোই দৃষ্টি এড়ায়নি। তুমিও নিশ্চয়ই দূর থেকে তা' লক্ষ্য করে থাকবে। তা'ছাড়া কালকের খবরের কাগজেই সব সংবাদ দেখতে পাবে। তাই না বাবা?

হ্যাঁ, ঠিকই বলেছ। ধরে নিলাম, পর্তুগীজরা হেরে ভূত হতে চলেছে। কিন্তু তাতে তোমার পড়াশুনোর কতোটা কি সুবিধা হবে সেটাই আমি জানতে চাই।

বারে, পড়াশুনো আমি বুঝি করি না। তা'হলে স্কুলে আমার এত সুনাম কেন? মাষ্টারমশাইরা আমায় এত ভালোবাসেন কেন?

আরেকটু বেশি করে পড়লে সেই সুনাম তোমার আরো বেড়ে যাবে।

তা' হয়তো হবে। তবে একটা যুদ্ধ যখন আরম্ভ করেছি, তাতে জয়ী হতে হবে তো। তোমরা সবাই তো বলো অন্যায়ের বিরুদ্ধে, অত্যাচারের বিরুদ্ধে এবং শোষণের বিরুদ্ধে লড়াই করতে হবে। আমিও তো তাই করছি। কোথায় তোমরা আমায় পুরোপুরি সমর্থন করবে, তা না করে মাঝে মাঝেই আমার বাধা হয়ে দাড়াও। লড়াইটা এবার তাড়াতাড়ি শেষ করে ফেলতে পারলে বাঁচি।

ছেলের অভিযোগ ও অভিমানের সুর খানিকটা দমিয়ে দেয় কেদারেশ্বরবাবুকে। গলার স্বরটাকে অনেকখানি নামিয়ে নিয়ে তিনি বললেন, না না বাবা, তুমি অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াই করবে তাতে আমরা বাধা হতে যাবো কেন? তোমার কল্যাণই আমাদের

প্রথম কামনা। তুমি বড়ো হও, তোমার নাম যশ হোক তাইতো আমরা চাই। সেখানে কি আমরা বাধা দিতে পারি?

বাধা দিচ্ছ বৈকি। পর্তুগীজদের আমি যখন এদেশ থেকে পাততাড়ি গুটিয়ে নেবার ব্যবস্থা করে ফেলেছি, সেই সময়ে একবার মা এবং আরেক বার তুমি এসে কেবলি আমায় পড়ার তাগিদ দিচ্ছ। রাতদিন কেবল 'পড়ো, পড়ো' বলে তাগাদায় কি পড়তে মন যায়?

এটা তুমি কি কথা বললে বাবা কমল? লেখাপড়ার সময়ে লেখাপড়ার কথাটা তোমায় মনে করিয়ে না দিলে তুমি যে দিনরাত যুদ্ধেই মেতে থাকবে। কই, তোমার দাদাকে তো পড়ার কথা বলতে হয় না, তার যে পড়াশুনো আর বিকেল বেলায় একটু খেলা ছাড়া অন্য কোনো ঝামেলাই নেই। দাদার মতো হও তোমাকেও আমাদের কিছু বলতে হবে না।

বেশতো আমি তোমাদের কথা দিচ্ছি, দাদার মতো আমিও প্রত্যেক বছর ক্লাসে ফার্স্ট হয়েই যাবো এবং স্কুল ফাইনালেও দাদার মতোই স্কলারশিপ নিয়েই পাশ করবো। তা'হলেই তো হলো। কিন্তু দিনরাত শুধু লেখাপড়া নিয়েই আমি পড়ে থাকতে পারবো না, সঙ্গে সঙ্গে আমি দেশের কাজও করে যাবো। দেশের মঙ্গলে তো আমাদের সবারই মঙ্গল।

চমৎকার কথা। নির্মলের মতো স্কলারশিপ নিয়ে পাশ করে তুমিও যদি কলেজে ভর্তি হতে পারো, তার চেয়ে আনন্দের আর কি হতে পারে? পড়ার বাইরের ব্যাপার নিয়ে তুমি বেশি মেতে থাকো বলেই তো আমাদের ভয়।

কিন্তু আমি রাতদিন ঝামেলা নিয়ে থাকলেও এবং অনেক কম পড়েও তো দাদার চেয়ে পরীক্ষায় আমি সব সাবজেক্টেই বেশি নম্বর পাই বাবা!

সে জন্যেই তো সবার কাছে তোমার বেশি আদর।

বাবার একথায় একটু অহংকার বোধ করে কমল এবং বলে, চলো বাবা আমার পড়ার ঘরে। পর্তুগীজদের সম্বন্ধে প্রশ্ন করে আমায় তুমি হারাতে পারো কিনা তাই আজ আমি দেখবো।

দাদার চেয়ে লেখা-পড়ায় আমি ভালো হবোই, দাদাকে আমি সব দিক থেকেই ছাড়িয়ে যাবো।—মনে মনে এমনি একটা প্রতিজ্ঞা কমলের অনেকদিন থেকেই।

কিন্তু মনের এ কথাটিকে মুখে কখনো প্রকাশ করেনি কমল। সবাই তাকে বেশি ভালোবাসে বলে বাবা যতোই তাকে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে তুলুন না কেন এবং তাতে তার যতোই গর্ব বোধ হোক না কেন, সে বেশ ভালো করেই জানে যে লোকে তার দাদাকেই বেশি ভালোবাসে। তার কারণ অনেক। কমলের দাদা নির্মল অনেক বেশি শান্ত শিষ্ট, খুবই ভদ্র এবং বিনয়ী। তা'ছাড়া অত্যন্ত মিষ্টভাষী ও কম কথার মানুষ। বাবার সঙ্গে তর্ক করার কথা নির্মল ভাবতেও পারে না। কিন্তু কমল কি রকম দিব্যি ঝগড়া জুড়ে দিলো বাপের সঙ্গে। ভয়-ডরের একটু চিহ্নও দেখা গেল না তার চোখেমুখে।

তা' হলেও কমলের বোধ হয় মনে হয়েছে যে বাবার সঙ্গে তর্কে সে একটু বাড়াবাড়ি করে ফেলেছে। তা' যে তার উচিত হয়নি সেটা বুঝতে পেরেই নিজের পড়ার ঘরে বাবাকে ডেকে নিয়ে এসে নিজের বিদ্যের দৌড় দেখাতে সে ব্যস্ত হয়ে উঠেছে।

আরেকটা বেফাঁস কথা বলে ফেলায় কমলের খুবই লজ্জা পেতে হচ্ছে। রাগের বশে সে বাবাকে শুনিয়ে দিয়েছে যে, অনেক কম পড়লেও দাদার চেয়ে সে সব সাবজেক্টেই বেশি নম্বর নিয়ে পাশ করে আসছে। আসলে তো কথাটা ঠিক নয়, দাদা যখন দু'বছর

আগে কমলের ক্লাসে পড়তো তখন দাদাও তার মতোই বেশি বেশি নম্বর পেতো।

সে সব খেয়াল রাখতে হবে বৈকি। ভাবতে গিয়ে খুবই লজ্জা পায় কমল।

যাকগে, বাবাকে তো ধরে নিয়ে আসা গেছে পড়ার ঘরে।

তাড়াতাড়ি কমল তার সৈনিকের পোশাকটা ছেড়ে ফেলে পরিষ্কার একটা পায়জামা ও গেঞ্জি পরে তার ইতিহাসের বইখানা নিয়ে বসে পড়ে বাবার কাছে।

ছোট ছেলের তৎপরতায় ভারি খুশি কেদারেশ্বরবাবু। পিঠ চাপড়ে বললেন ছেলেকে, এইতো চাই—পড়ার সময় পড়বে, খেলার সময় তেমনি এক মন নিয়ে খেলবে।

কিন্তু পর্তুগীজদের বিরুদ্ধে আমার লড়াইটাকে খেলা বলে ধরবে না বাবা। এ বছরের মধ্যেই ওদের যদি ভারত-ছাড়া করতে না পারি তা' হলে আমি আমার কমল ঘটক নামই পাল্টে দেবো।

এ যে দুর্জয় সংকল্প দেখছি।

মন্তব্য করলেন কেদারেশ্বরবাবু।

নিশ্চয়ই। তুমিই তো বলেছিলে, প্রতিজ্ঞায় যদি অটল অবিচল থাকা যায় তাহলে সাফল্য অবধারিত। তোমার সে কথা তো আমাদের জীবনেই সত্য হয়েছে। প্রতি বছর পরীক্ষায় আমরা দু'ভাই-ই তো ফার্স্ট হয়ে চলেছি।

ভেরি গুড।

ছেলের উত্তরে আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠেন কেদারেশ্বরবাবু। বলেন, এইতো চাই, এমনি প্রতিজ্ঞা নিয়েই এগুতে হবে জীবনে। হ্যাঁ সত্যি বলছি বাবা, আমাদের দেশের একটা অংশ গোয়া, সেখানে আরেক দেশের লোকদের রাজধানী থাকবে, রাজত্ব চলবে তা' আমরা আর হতে দেবো না।

কিন্তু যে গোয়ার কথা তুমি বলছো তার সম্বন্ধে কোনো পড়াশুনো আছে তোমার? গোয়াটা কি, কোথায় সে সব জানো তুমি?

জানি বৈকি।

বলেই দেয়ালে টাঙানো ম্যাপটার দিকে ছুটে যায় কমল, মানচিত্রে ভারতের পশ্চিম উপকূলের ঠিক জায়গায় আঙুল রেখে গোয়ার অবস্থান বাবাকে দেখিয়ে দিয়ে বলে, ইতিহাসে পড়েছি গোয়া বন্দর ছিল বিজাপুরের সুলতানদের। ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম দশক শেষ হবার আগেই পর্তুগীজ গভর্ণর আলফেন্সো দ্য আলবুকার্ক এই গুরুত্বপূর্ণ বন্দরটি অধিকার করে নেন। শুধু এই নয়, প্রথম থেকেই আলবুকার্ক গোয়াকে ভারত প্রবাসী পর্তুগীজদের তো বটেই, এশিয়া আফ্রিকার সমগ্র পর্তুগীজ বাণিজ্য-সাম্রাজ্যেরই মূল ঘাঁটি করার দিকে ঝুঁকে পড়েন। জায়গাটি তাঁর খুবই ভালো লেগেছিল কিনা তাই।

ভালো তো লাগবেই, সমুদ্রের ধারে অতো বড়ো বন্দর—চমৎকার প্রাকৃতিক দৃশ্য, ভালো না লেগে পারে কখনো? কিন্তু তুমি কি জানো যে বিদেশীরা যাকে 'পর্তুগীজ ভারত' বলে তার আসল প্রতিষ্ঠাতা হলেন এই আলবুকার্ক?

তাই বুঝি? হ্যাঁ, তবে এটুকু জানি আলবুকার্ক এদেশে এসেছিলেন একজন পর্তুগীজ গভর্ণর অর্থাৎ ভারতের পর্তুগীজ স্বার্থ ও সম্পদের রক্ষক এবং প্রবাসী পর্তুগীজদের পরিচালক হিসেবে।

ছেলের এ উত্তরে মোটামুটি খুশিই হন কেদারেশ্বরবাবু। কিন্তু কমল যখন জিজ্ঞেস করে,আচ্ছা বাবা,গোয়া জয়ের পর আলবুকার্কও নাকি ভীষণ অত্যাচারী হয়ে উঠেছিলেন, তাঁর অত্যাচারের কিছু কিছু কাহিনী আমায় বলবে বাবা, তখন তাঁকে একটু চিন্তায়ই পড়তে হয়। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে কেদারেশ্বরবাবু উত্তর দেন।

বলেন, সে যে অনেক ঘটনা বাবা, সুদীর্ঘ কাহিনী। ভাস্‌কো-দা-গামা বা পেড্রো আলভ্যারেজ ক্যাব্রালোর চেয়ে কোনো অংশেই কম নিষ্ঠুরতার পরিচয় দেননি আলবুকার্ক। তাঁর কথা এবং পর্তুগীজ-ভারতের পরের শাসকদের দস্যুতার কথা বলে শেষ করা কি সহজ ব্যাপার? অনেক সময়ের দরকার।

সময়ের কি এমন অভাব বাবা? এখন তো সাতটাও বাজেনি, রাত দশটা অবধি তো আমরা লেখাপড়া করেই থাকি।

কমল একেবারে নাছোড়বান্দা, পর্তুগীজদের নিষ্ঠুরতা ও অত্যাচারের সব কাহিনী আজই সে বাবার কাছ থেকে ভালো করে জেনে নেবে। তার সৈন্য-সামন্তদের সে সকল কথা জানিয়ে দিয়ে তাদের এমন ভাবে উত্তেজিত করবে যাতে ক্ষেপে গিয়ে তারা পর্তুগীজদের বিরুদ্ধে আরো বেশি মারমুখী হয়ে ওঠে এবং কালই তাদের এদেশ থেকে তাড়িয়ে দেয়।

ছেলের আবদারে ভারি মজা লাগে কেদারেশ্বরবাবুর।

বেশ, তুমি যখন পর্তুগীজদের গল্প শুনতে এতো ব্যগ্র, তাহলে তাই শোনো।

এই বলে বাবা একটু মুচকি হাসতেই কমল জিজ্ঞেস করে বসলো, আচ্ছা বাবা, ঐ যে দা-গামা না কি, সেই পর্তুগীজ নাবিক তো বার কয়েকই আমাদের দেশে এসে ধনরত্ন লুটপাট করে নিয়ে গেছে। তাই না?

হ্যাঁ, ঠিকই বলেছ, ঐ ভয়ংকর লোকটি তিন তিনবার এসেছেন এই দেশে। শুধুমাত্র ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্যেই নয়, পর্তুগালের তখনকার রাজা ম্যানুয়েলের ছিল দু'টো লক্ষ্য। ইয়োরোপের বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ইতালীর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলেই ম্যানুয়েল খুশি থাকতে পারেন নি, তাঁর দেশের নাবিকদের যেরকম নাম-ডাক তাতে প্রাচ্যের বাজার দখল করে অনায়াসেই ইতালীকে বাণিজ্যের

লড়াইয়ে হটিয়ে দেওয়া যায়, এও যেমন রাজা ম্যানুয়েল ভাবছিলেন, ঠিক তেমনি তাঁর আবার ছিল পুণ্য লাভেরও লোভ।

সেটা আবার কি বাবা?

অবাক হয়ে প্রশ্ন করে কমল।

কেন, পাপ-পুণ্য কাকে বলে জানো না তুমি? তোমার মা যে রোজ পুজোআর্চা করেন, মা দুর্গা মা লক্ষ্মীর সামনে ধূপদীপ জ্বালিয়ে দেন, গঙ্গা স্নান করেন—এ সবই তো পুণ্য লাভের আশায়।

সে তো আমি জানিই। কিন্তু পর্তুগালের রাজা এমন কী কাজ ভারতে করতে চেয়েছিলেন যাতে তাঁর পুণ্য অর্জন হতে পারে, সেটাই আমি জানতে চাই।

বেশ, শোনো তা'হলে।

কেদারেশ্বরবাবু বলতে আরম্ভ করলেন।

পর্তুগাল অধিপতি ম্যানুয়েলের ইচ্ছে পূরণের কথাই বলি তা'হলে। স্পেন এবং ইতালীর সঙ্গে প্রতিযোগিতায় ব্যবসা-বাণিজ্যের বাজার বাড়ানোর দিকে যেমন তাঁর ঝোঁক ছিল অত্যন্ত বেশি, তেমনি ঐ রোমান ক্যাথলিক রাজার একরকম দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, অখ্রীষ্টানদের খ্রীষ্টান করতে পারলে তাঁর পরম পুণ্য লাভ হবে।

রোমান ক্যাথলিকটা কি বাবা?

সে তুমি আরো বড়ো হলে ভালো করে বুঝবে। হিন্দুদের মধ্যে মুসলমানদের মধ্যে, প্রায় সব ধর্মবিশ্বাসের লোকদের মধ্যেই নানা রকম ভাগবিভাগ আছে। এই রোমান ক্যাথলিকরা হলেন খ্রীষ্টানদের মধ্যে তেমনি একটি ভাগ যাদের বলা যায় আদি খ্রীষ্টান, যাঁরা পোপের নেতৃত্বে পূর্ণ বিশ্বাসী। তেমনি একজন গোঁড়া রোমান ক্যাথলিক ছিলেন পর্তুগাল রাজ ম্যানুয়েল।

এই পোপ ভদ্রলোক কে বাবা, কোথায় থাকেন তিনি?

পোপকে রোমান ক্যাথলিকরা মনে করেন স্বয়ং যীশুখ্রীষ্টের প্রতিনিধি বলে। ইতালীর রাজধানী রোম, সে তো তুমি জানই। সেই রোমেরই কাছে একটি ছোট্ট সুন্দর শহর আছে তার নাম ভ্যাটিকান। সেই ভ্যাটিকান হলো পোপের নিজের শহর। খ্রীষ্টান জগতের অধিপতি হলেন পোপ আর ভ্যাটিকান তাঁর রাজধানী। এই পোপেরই পরম ভক্ত ছিলেন রাজা ম্যানুয়েল। খ্রীষ্টধর্মের বিস্তার করে পোপকে খুশি করা এবং তার ফলে যীশুর আশীর্বাদ পাওয়া এবং সঙ্গে সঙ্গে নিজের দেশকে সম্পদশীল করে তোলবার জন্যে প্রাচ্য দেশে নতুন বাজার খুঁজে বার করার দায়িত্ব দিলেন রাজা ম্যানুয়েল অসীম সাহসী দুরন্ত নাবিক ভাস্‌কো-দা-গামার ওপর।

ও, পর্তুগীজ রাজার কথাতেই তা'হলে ভাস্‌কো-দা-গামা এই দেশে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন। কদ্দিন ছিলেন তিনি ভারতে প্রথম যাত্রায়?

গম্ভীর মন দিয়ে বাবার কথা শুনতে শুনতে প্রশ্ন করলো কমল।

লিসবন থেকে সরাসরি উত্তমাশা হয়ে এবং প্রায় এগার মাস সমুদ্রে কাটিয়ে চারখানা জাহাজ ভর্তি মালপত্র ও নাবিক নিয়ে ১৪৯৮ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে পশ্চিম ভারতের কালিকট বন্দরে পেঁছে মাত্র মাস তিনেক ছিলেন তিনি সেখানে। আট মাইল ব্যাপী অঞ্চল কালিকটের রাজা অর্থাৎ জামোরিনকে পর্তুগালরাজের উপহারাদি দিয়ে তাঁর সঙ্গে বেশ ভাব করে নিয়েছিলেন তিনি। বন্দরের চারিদিকে ঘুরে-বেড়িয়ে তাঁর মনে হলো বাণিজ্যের পক্ষে এদেশ অতুলনীয়। তবে সব জাতির মানুষ কালিকটে সমান ব্যবহার পেলেও আরবের মুসলমানরাই বাণিজ্যে একাধিপত্য করছে সেখানে। শুধু বাণিজ্যিক উপার্জনই নয়, মোগল সাম্রাজ্যের দৌলতে সারা হিন্দুস্থান থেকে যেমন-তেমন মক্কায় 'হজ' যাত্রী

আনা-নেওয়ার ধর্মীয় ব্যবসায়েও প্রচুর অর্থ উপায় করতো তারা। মুর নামে পরিচিত এই মুসলমানদের উচ্ছেদ করে তাদের স্থানাধিকারই ছিল ভাস্‌কো-দা-গামার মূল লক্ষ্য এবং এও তিনি লক্ষ্য করেছিলেন, নায়ার শ্রেণীর হিন্দু রাজা জামোরিন ও তাঁর হিন্দু প্রজাদের উপাসনা-বিধির সঙ্গে খ্রীষ্টান পদ্ধতির অনেক মিল রয়েছে। কাজেই একটু চেষ্টা করলেই বহু হিন্দুকে খ্রীষ্টান করে নেওয়া যাবে।

তাই বুঝি ভেবেছিলেন ভাস্‌কো-দা-গামা?

হ্যাঁ, ঐ দুটি রিপোর্ট রাজার কাছে পেশ করার জন্যেই তিন মাসের মধ্যেই তিনি নিজের দেশে ফিরে গিয়েছিলেন। রাজাকে তিনি সবটাই এতো সহজ করে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন যে তা' শুনলে তুমিও অবাক হয়ে যাবে।

কি তা' বলোই না শুনি।

ছেলের তাগিদে বলতেই হয় কেদারেশ্বরবাবুকে।

তিনি বললেন, ভাস্‌কো-দা-গামা পর্তুগাল অধিপতিকে রিপোর্ট দিলেন, জামোরিন অত্যন্ত দুর্বল রাজা। অন্যান্য রাজাদের তাঁর বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিয়ে তাঁকে জব্দ রাখা এবং বাগে আনা মোটেই কোনো কঠিন ব্যাপার নয়। আর ভারতে হিন্দুদের যে কালী মা দেখা যায় তাকে যীশুজননীরই অন্য সংস্করণ বলা চলে এবং দেবকীর কোলে কৃষ্ণের যে মূর্তি তা দেখে তাঁর মনে হয়েছে যেন মেরী মাতার কোলে শিশু খ্রীষ্ট। কাজেই ভাস্‌কো-দা-গামা তাঁর দেশের রাজাকে বেশ সহজেই বুঝিয়ে দিলেন, জনকয়েক ভালো পাদরীকে পাঠিয়ে দিলেই তামাম হিন্দুস্থানকে বিনা ঝামেলায়ই খ্রীষ্টান বানিয়ে ফেলা যাবে এবং পর্তুগালের পক্ষে ভারতে একচেটিয়া বাজার করে বসাও মোটেই কঠিন হবে না। এ রিপোর্ট পেয়ে রাজা ম্যানুয়েল সন্তুষ্ট হয়ে গামাকে বহু ধনরত্ন দিয়া পুরস্কৃত করেই ক্ষান্ত হলেন না, তাঁকে সেই মহামান্য 'ডন' উপাধিতে ভূষিত করলেন যে উপাধি

পূর্বে রাজপরিবারের খ্যাতিমানদের এবং উচ্চপদস্থ ধর্মযাজকদেরই শুধু দেওয়া হতো।

তাই নাকি ?

যেমন এই প্রশ্ন তুলেছে কমল, অমনি রান্নাঘর থেকে হাঁক ছেড়েছেন মঞ্জুলা দেবী, তোমাদের কি আজ রাতে খাওয়া দাওয়া নেই নাকি ?

এরপর বাপ-ছেলে আর ভরসা পায় না গল্প করার। সঙ্গে সঙ্গেই উঠে পড়ে কমল হেঁকে বলে, এক্ষুনি আসছি মা। তোমাকে আর আমরা কষ্ট দেবো না।

ক'দিন ধরে প্রচণ্ড যুদ্ধ চালিয়ে বেশ একটু ক্লান্তই বোধ করছিল জেনারেল কমল ঘটক।

তাই রাতের খাওয়া-দাওয়ার পরেই সেদিন গিয়ে শুয়ে পড়েছিল কমল। শরীরটাকে ভালো করে, একটু বেশি করে বিশ্রাম দিতে পারলে দেহ-মন আরো মজবুত হয়ে উঠবে, আরো জোর লড়াই সে চালাতে পারবে, এই ছিল তার আশা।

কিন্তু ঘুমের মধ্যেও যদি যুদ্ধ চালাতে হয়, যুদ্ধের কথাই কেবল ভাবতে হয় তা'হলে বিশ্রাম আর হবে কি করে ?

সত্যি, সারারাত ধরে কমল শুধু স্বপ্নই দেখেছে। স্বপ্নের মধ্যে যে কেবল প্রতিদিনের গোয়া-যুদ্ধের ছবিই তার সুপ্ত চেতনায় ভেসে উঠেছে তাই নয়, মাঝে মাঝে সে তার সৈন্যদের উদ্দেশে চীৎকার করে হুকুম জারী করেছে হার্মাদী পর্তুগীজ সৈন্যদের কোতল করতে, খতম করতে।

সেই চীৎকার শুনে কয়েকবারই তার মা-বাবা ছুটে এসেছেন

তাঁদের ছোটছেলের কাছে, কি হলো দেখতে। ছেলে যে তাঁদের ঘুমের মধ্যেই স্বপ্নরাজ্যে লড়াই করে চলেছে গোয়ায় পর্তুগীজদের সঙ্গে তা' বুঝতে পেরে প্রতিবারই তার গায়ে-মাথায় হাত বুলিয়ে তাঁরা বিদায় নিয়েছেন।

স্বপ্নে কিন্তু একেবারে গোয়া সত্যাগ্রহ থেকে শুরু করে ধারাবাহিক ভাবে গোয়ায় ভারত সরকারের সামরিক অভিযানের প্রতিদিনের চিত্র কমল দেখে চলেছে। আর সেই সব ছবি দেখতে দেখতেই তার মনে একটি প্রতিজ্ঞা দৃঢ় হয়ে উঠেছে, এই ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যেই পর্তুগীজদের ভারত ছাড়া করতে হবে, ভারতের মাটি থেকে বিদেশী শাসনের অবসান ঘটাতে হবে। আসন্ন নতুন বছরে এই পুণ্যভূমিতে পরশাসনের কোনো কলঙ্কচিহ্ন আমরা রাখতে দেবো না।

আর সে দিন তো আসন্ন প্রায়! বছরের আর কয়েকটা দিন মাত্র বাকি। হ্যাঁ এ কয়দিনের মধ্যেই কর্ম ফতে হয়ে যাবে।

স্বপ্নের মধ্যেই উল্লাসে অধীর হয়ে ওঠে কমল। গত কয়দিনের খবরের কাগজে গোয়াযুদ্ধের যতো সংবাদ সে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়েছে তার প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি এক একটি জ্বলন্ত অক্ষরের মধ্যে দিয়ে তার চোখের সামনে যেন জ্বলে জ্বলে উঠেছে।

এইতো সে দিন অর্থাৎ একষট্টির সতেরোই ডিসেম্বর গোয়া অভিযান শুরু হয়েছে। সর্বাধিনায়ক মেজর জেনারেল চৌধুরী।

পরদিনের সংবাদপত্রে যে খবর বেরিয়েছে তা' চোখে ভাসছে কমল ঘটকের।

সত্যই তো ক্রমাগত চৌদ্দ বছর ধরে প্রধান মন্ত্রী জওহরলাল নেহরু বার বার শান্তিপূর্ণ উপায়ে গোয়া সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করে আসছেন: বারবারই সব আলাপ আলোচনা অন্যপক্ষ ব্যর্থ করে দিয়েছে। ওরা জানিয়ে দিয়েছে, পর্তুগীজ শাসিত ভারতীয় অঞ্চল

পর্তুগালের একটি অংশ। কী অসম্ভব অস্বাভাবিক কথা! এমন আজগুবি দাবী দস্যু দেশ পর্তুগাল তুলতে সাহস পেয়েছে ইংরেজ আর আমেরিকানদের কাছে আস্কারা পেয়ে, আর পাকিস্তানের ভরসায়। ভারত-বিরোধী যে-কোনো ব্যাপারেই পাকিস্তানের পুরোপুরি সমর্থন পাওয়া যাবে, এ বিষয়ে পর্তুগাল নিশ্চিত এবং সে সমর্থনের কথা পাকিস্তানের পক্ষ থেকে প্রকাশ্যেই ঘোষণা করা হয়েছে। বৃটেন এবং আমেরিকাও পর্তুগালের পক্ষেই ওকালতি করে চলেছে। এ অবস্থায় কি আর চুপ করে থাকা সম্ভব?

না, মোটেই নয়। কিছুতেই আর সহ্য করা চলে না।

এই বলে জোর চেঁচিয়ে ওঠে কমল।

কী সহ্য করা চলে না, কী হয়েছে, কে কী করেছে?

ছোটছেলের হাঁক শুনেই জেগে উঠে বলতে বলতে ছুটে আসেন মঞ্জুলা দেবী।

না, ততক্ষণে চুপ করে গেছে কমল। মায়ের হাত মাথায় পড়তেই আরো শান্ত হয়ে ঘুমুতে থাকে সে। সেই ঘুমন্ত অবস্থায় ঐ স্বপ্নের মধ্যেই গোয়া যুদ্ধের ঘটনাবলী একটা চক্রের মতো করে আবার তেমনি ঘুরতে শুরু করে জেনারেল কমলের স্বপ্নঘন চোখের সামনে।

হ্যাঁ, ঠিকই করেছেন ভারত সরকার। আর সুযোগ নেই কোনো আলাপ আলোচনার। আর সময়ও দেওয়া যায় না শত্রুপক্ষকে। ওরা তা'হলে প্রস্তুতির সুযোগ পেয়ে যাবে। তাই হায়দরাবাদ বিজয়ী বীর মেজর জেনারেল চৌধুরীর নেতৃত্বে গোয়া অভিযানের নির্দেশ দিয়েছেন আমাদের সরকার। সতেরোই ডিসেম্বর মধ্যরাতে জলপথে এবং স্থলপথে ত্রিমুখী আক্রমণ শুরু করা হয়েছে গোয়ার ওপর। বিমান বাহিনীও সে আক্রমণে সাহায্য করেছে।

উঃ! কী প্রচণ্ড বেগ ভারতীয় বাহিনীর! সে বেগকে প্রতিরোধ

করতে এসে, বাধা দিতে এসে চুরমার হয়ে গেছে পর্তুগীজ সৈন্যদল। ব্যস্, আর ভাবনা নেই।

ঐ তো ভারতীয় সৈন্যগণ দলে দলে ঢুকে পড়ছে গোয়ায়। এবারে কি করবে পর্তুগীজ সোনারচাঁদেরা? পালাবার আর পথ পাচ্ছে না এখন, তাই না?

খুবই আনন্দ কমলের। ঘুমের মধ্যেই ভাবতে ভাবতে অস্থির হয়ে ওঠে সে। একজনও পর্তুগীজ সৈন্য যাতে পালাতে না পারে সেই খবরদারী আরম্ভ করে দেয় ঘুমন্ত জেনারেল। সহসা হুকুম জারী করে সে গর্জে ওঠে, ক্যাপ্টেন বাচ্চু, স্যুট দেম, স্যুট অল অব দেম। নো মার্সি।

কেদারেশ্বরবাবু তখনো বসে বসে পরীক্ষার খাতা দেখছিলেন।

ডিসেম্বর মাসের প্রথম ভাগেই স্কুলের পরীক্ষা শেষ হয়ে গেছে। মাসের শেষ সপ্তাহেই খাতা দেখা শেষ করতে হবে। সেই খাতা দেখতে দেখতেই ছেলের কণ্ঠে আকস্মিক ঐ হুংকার শুনে আঁৎকে উঠলেন তিনি।

দেখো, কি হতচ্ছাড়া ছেলে। ঘুম থেকে উঠে গিয়ে আবার বোধ হয় কমলটা তার সাজানো যুদ্ধক্ষেত্রে লড়াই শুরু করে দিয়েছে বাচ্চুটাকে সঙ্গে নিয়ে। কথাটা মনে আসতেই খাতাপত্র ফেলে দৌড়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যান কেদারেশ্বরবাবু। মঞ্জুলা দেবী তখন ঘুমে অচেতন। তা হবেই তো। রাত যে তখন প্রায় একটা। তা'ছাড়া পরিশ্রমেরও তো একটা ক্লান্তি আছে।

কিন্তু কোথায়, বারান্দার কোথাও তো কমল বা বাচ্চু নেই। তা' হলে নিশ্চয়ই স্বপ্ন দেখছে ছেলেটা, স্বপ্নের মধ্যেই চেঁচিয়ে উঠে শত্রু-সৈন্য সাবাড় করার হুকুম দিচ্ছে। তাই হবে।

সে বিষয়ে নিশ্চিত হয়েই কেদারেশ্বরবাবু চুপি চুপি চলে যান তাঁর ছোটছেলের ঘরে।

হ্যাঁ, ঠিকই ঘুমুচ্ছে শ্রীমান। নিজের খাটে শুয়ে শুয়ে দিব্যি চোখ বুঁজে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে পর্তুগীজদের সঙ্গে! ছেলের কাণ্ড-কারখানা দেখে হাসি পেয়ে যায় কেদারেশ্বরবাবুর। নিজের হাতে মুখ চেপে রাখতে হয় তাঁকে।

কিন্তু একি, ঘুমের মধ্যে কমলও যে হো-হো করে হেসে উঠলো হঠাৎ। তার অর্ডার পেয়ে ক্যাপ্টেন বাচ্চু এবং তার অন্যান্য চেলা-চামুণ্ডারা কচুকাটা করছে শত্রুসৈন্যদের, তাই ভেবেই বোধ হয় কমল অমনি প্রাণখোলা আনন্দের হাসি হাসছে।

ঠিকই ধরেছেন কেদারেশ্বরবাবু, তবে কমল যে শত্রু ঘায়েলের কথা ভেবে হেসেছে তা নয়, দেখে হেসেছে—কল্পনার কাজলমাখা ঘুমের চোখে পর্তুগীজ সেনাদের পতন প্রত্যক্ষ করে সে আনন্দে হেসে উঠেছে।

তাড়াতাড়ি কেদারেশ্বরবাবু গিয়ে ছেলের গায়ে-মাথায় হাত বুলিয়ে দিতেই কমল আবার একেবারে ঠাণ্ডা নিস্তব্ধ।

নিঃশব্দ পায়ে কেদারেশ্বরবাবু তাঁর নিজের ঘরে তখন চলে গেলেন ধীরে ধীরে।

কমলের চোখে গভীর ঘুম তখন। তা' হলেও সেই ঘুমের দেশেই সে অবিরাম গোয়া যুদ্ধের চিত্র-মিছিল দেখে চলেছে।

ঐ যে গোয়ায় প্রবেশ করার পর থেকেই ভারতীয় বিমান থেকে সেখানে হাজার হাজার ইস্তাহার ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। ঐ যে গোয়াবাসীরা সেই সব ইস্তাহার পথ-ঘাট-প্রান্ত থেকে কুড়িয়ে কুড়িয়ে নিয়ে গভীর মনযোগের সঙ্গে পড়ছেন। তাতে বলা হয়েছে, পর্তুগীজদের অত্যাচার থেকে তাঁদের ধনসম্পত্তি ও জীবন-মান রক্ষার জন্যেই ভারতীয় প্রতিরক্ষা বাহিনী গোয়ায় প্রবেশ করেছে। তাঁদের ভয় পাবার বিন্দুমাত্র কারণ নেই।

গোয়াবাসীরা কি আর জানে না সে কথা, নিশ্চয়ই জানে।

তারা যে বারবার বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে পর্তুগীজ শাসনের বিরুদ্ধে কমল সে কথা তার বাবার মুখ থেকেই শুনেছে। কিন্তু ইস্তাহারে গোয়াবাসীদের কাছে যে আবেদন জানানো হয়েছে সেটাই হলো আসল কথা।

সেই আবেদনের কথাগুলো জ্বল জ্বল করে উঠছে কমলের সামনে। তাতে বলা হয়েছে, যে জন্মভূমি ভারত থেকে গোয়াবাসী আপনারা বহুকাল ধরে বিচ্ছিন্ন হয়ে রয়েছেন, সেই স্বদেশ জননীর সম্মান ও নিরাপত্তা রক্ষা করাই গোয়া অভিযানকারী এই সব সৈন্যের একমাত্র লক্ষ্য।

না, না, এখানেই শেষ নয়। ঐ তো আরো লেখা রয়েছে ইস্তাহারে, সেখানে গোয়াবাসীদের সাবধান করে দেওয়া হয়েছে, সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে। ঐ যে দেখতে পাচ্ছ না ইস্তাহার পত্রের শেষটায় কি বলা হয়েছে ? সর্বদা সতর্ক ও প্রস্তুত থাকতে হবে গোয়াবাসীদের, কারণ পর্তুগীজ হার্মাদরা গোয়া ছেড়ে যাবার সময় সবকিছু ধ্বংস করে একেবারে তচনচ করে দিয়ে যাবার মতলব এঁটে থাকতে পারে। তাই খুবই সতর্ক থাকতে হবে।

যাই হোক, ও ব্যাটাদের এবার ভারত ছেড়ে টুপি ফেলে পালাতেই হবে। আমাদের সৈন্যরা গোয়ার রাজধানী পাঞ্জিমের দরজায় গিয়ে উপস্থিত। তিন দিক থেকে ঘিরে ফেলা হয়েছে পাঞ্জিম শহরকে। আর কতক্ষণ ? রাজধানীর পতন তা' হলে আসন্ন।

ঐ যে গোয়ারই একদল মাঝি নিজেরাই উদ্যোগী হয়ে ভারতীয় সৈন্যদের নদী-পার করে দিচ্ছে। কি চমৎকার। ফাইন, থ্যাঙ্কস্।

আবার চেঁচিয়ে ওঠে জেনারেল কমল ঘটক।

এবার মঞ্জুলা দেবীর ঘুম ভেঙে যায় সে চীৎকারে। তিনি ছুটে আসেন। এসব ডাক-চীৎকার সবই যে একটা মানসিক উত্তেজনার ফল, তা' তিনি পরিষ্কার বুঝতে পারছেন। তবু গোয়ার ব্যাপার নিয়ে

এতোদিন ধরে যে ঝামেলা চলেছে কবে যে তা' শেষ হবে সেটাই তিনি ঠিক করতে পারছেন না। এই গোয়া-গোয়া করে তাঁর সোনার ছেলে কমলের মাথাটাই না বিগড়ে যায়। সেই ভয়েই মঞ্জুলা দেবী ছেলের মাথার চুলে হাত বুলু'তে বুলুতে প্রার্থনা করেন, হে ভগবান, আমার কমল যেন ভালো লেখাপড়া শিখে বড়ো চাকুরে হয়—সৈন্য-সামন্ত যেন না হতে যায়। ঐসব মারামারি কাটাকাটি আমার ভালো লাগে না। বড়ো ভয় লাগে।

আর কোনো কথা নেই কমলের মুখে। শুধু খবরের কাগজে সকাল বেলায় যা পড়েছে, গোয়া যুদ্ধের দ্বিতীয় দিনের সেই সংবাদগুলোই তার চোখের সামনে দিয়ে যেন লাফিয়ে লাফিয়ে অনেক দূরে চলে যাচ্ছে।

পাঞ্জিমে ঢুকতে তেমন কোনো বাধাই পাচ্ছে না ভারতীয় বাহিনী। বরং দেখা যাচ্ছে ভারতীয় সৈন্যরা গিয়ে হাজির হবার আগেই অনেক ঘাঁটি ছেড়ে শত্রুসৈন্য পূর্ব পরিকল্পনা মতো আত্ম-রক্ষার তাগিদে পালিয়ে গেছে।

শুধু কি তাই, অনেক পর্তুগীজ বড়ো বড়ো কর্তা-ব্যক্তি এরই মধ্যে নিজ নিজ জান, বিবি আর ছাওয়ালপানদের নিয়ে উধাও হয়েছেন পাকিস্তানে। এক সময়ে যেখানকার লোকেরা যথেচ্ছ অত্যাচারিত হয়েছে এই পর্তুগীজদের হাতে সেই হালের পাকিস্তান আজ তাদের প্রাণের দোসর।

ঠিক আছে, যঃ পলায়তি স জীবতি, বাকি বাছাধনেরা এবং তাদের সাকরেদরা যাবে কোথায়? এদিকে যে খবর এসে গেছে, দমন ও দিউ ভারতীয় বাহিনীর সম্পূর্ণ দখলে এসে গিয়েছে এরই মধ্যে।

এতদিনে তা' হলে পর্তুগালের ভারত-শোষণের ও ভারতের বুকে বসে দস্যুতা চালানোর অবসান হতে চলেছে। ভাবতে গিয়ে খুশিতে মেতে ওঠে জেনারেল কমল।

কিন্তু এ কি ব্যাপার, ভারত যাতে অবিলম্বে যুদ্ধ বন্ধ করে পর্তুগীজ উপনিবেশ ছেড়ে চলে যায়, সেই মর্মে নির্দেশ দেবার জন্যে রাষ্ট্রসঙ্ঘের স্বস্তিপরিষদের জরুরী বৈঠক আহ্বানে জোর তাগিদ দিচ্ছে পর্তুগাল। চাতুরী খেলবার আর জায়গা পেলো না ব্যাটারা। ভেবেছে এইভাবে হয়তো বেঁচে যাওয়া যাবে।

কিন্তু এ কি খুব একটা সহজ ব্যাপার? আরে স্বস্তিপরিষদের বৈঠক ডাকতে ডাকতে এদিকে যে কেল্লা ফতে হয়ে যাবে।

হ্যাঁ, তাই তো হতে চলেছে। ঐ তো দেখা যাচ্ছে পর্তুগীজদের বিরাট যুদ্ধজাহাজ আলবুকার্ক বহু সৈন্যসামন্ত ও গোলাবারুদ নিয়ে সমুদ্রে ডুবে যাচ্ছে। ভাস্‌কো-দা-গামার পর সবচেয়ে বড়ো পর্তুগীজ অত্যাচারী আলবুকার্ক। সেই দস্যু শাসকের নামেই তাদের ঐ প্রকাণ্ড যুদ্ধ জাহাজটার নাম দিয়েছিল। সেই আলবুকার্ক জাহাজটাই ডুবছে। ঐ-তো, ঐ-তো।

কমল আরেকবার ঘুমের মধ্যে চীৎকার করে উঠলো। কিন্তু তখন ভোর হয়ে গেছে।

আগের রাতে অনেকগুলি অঙ্ক কষেছে নির্মল। তার ধারণা, সব কটাই সে ঠিক-ঠিকমতো করতে পেরেছে, তবু তার মনে হয়েছে, বাবাকে একবার দেখিয়ে নেওয়া ভালো।

সব অঙ্ক রাইট হয়েছে দেখতে পেলে বাবারও তো নিশ্চয়ই খুব আনন্দ হবে।

তা' ভেবেই সকাল বেলায় অঙ্কের খাতা নিয়ে নির্মল গিয়ে তার বাবার কাছে হাজির।

অঙ্ক ক'টা একটু দেখে দেবে বাবা?

নির্মলের কণ্ঠস্বর শুনে প্রথমে কেমন যেন একটু চমকে উঠলেন কেদারেশ্বরবাবু।

ঘুম ভাঙলেও তখনো তিনি লেপ ছেড়ে উঠতে পারেন নি, আলস্যে তখনো পর্যন্ত লেপ মুড়ি দিয়েই শুয়ে শুয়ে একথা-সেকথা ভাবছিলেন মনে মনে। বিশেষ করে ছোটছেলের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের কথাই ভাবছিলেন।

বড়ো ছেলের ডাকে চমকে উঠে লেপ ফেলে বসে পড়লেন কেদারেশ্বরবাবু। বললেন, দেখি দেখি, কতগুলো অঙ্ক করেছো বাবা।

খাতাখানা হাতে নিয়ে পৃষ্ঠা ওল্টাতে ওল্টাতে কেদারেশ্বরবাবু অবাক।

এ কি, খাতা যে একেবারে ভরে ফেলেছো দেখছি। সারারাত জেগে অঙ্ক করেছো বুঝি। নিশ্চয়ই একটুও ঘুমুতে পারনি, তাই না?

না বাবা অঙ্ক কষতে কষতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছি তা' একটুও বুঝতে পারিনি। যতদূর মনে পড়ছে উনত্রিশ নম্বরের অঙ্কটা করতে করতে আমার ঘুম এসে গিয়েছিল।

চমৎকার দু'টি ভাই-ই বটে। একজন অঙ্ক নিয়েই রাত কাটিয়ে দিলে, আর আরেক ভাইয়ের তো কথাই নেই—সারা রাত ধরে কেবল যুদ্ধ আর যুদ্ধ।

তাই বুঝি? কমল বুঝি সারারাত ধরেই তার যুদ্ধ যুদ্ধ খেলা চালিয়েছে।

অবাক হয়ে বাবার কাছেই ছোট ভাইটির কথা জানতে চায় নির্মল।

আর ঠিক সেই সময়ই নির্মলের মা এসে সেখানে উপস্থিত। তিনি না বলে পারলেন না, একেবারে বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করেই বলে ফেললেন, শুধু ছেলেরা কেন, ছেলেদের বাবাই বা কম যান কিসে? তিনিও তো পরীক্ষার খাতা দেখায় একদম ধ্যানস্থ হয়েই রাত ভোর করে দিয়েছেন।

যাকগে ও নিয়ে আর কথা বাড়িয়ে লাভ নেই। তুমি দেখে এসো

তো বাবা নির্মল, ভাইটি তোমার ঘুমুচ্ছে না জেগে গেছে। ঘুমিয়ে থাকলে জাগিও না ওকে। সারারাত কি আর ঘুমিয়েছে ছেলেটা, কেবল যুদ্ধ যুদ্ধ করে বার বারই শুধু লাফিয়ে লাফিয়ে উঠেছে।

আমি যাচ্ছি।—বলেই কমলের ঘরের দিকে যায় নির্মল।

হ্যাঁ যাও আমি ততক্ষণে তোমার অঙ্কগুলি দেখছি।

কমল এখনো লেপমুড়ি দিয়ে ঘুমুচ্ছে বাবা। খুব জোর ঘুমুচ্ছে। আমি দু' দু'বার ডেকেছি, তাও শুনতে পায়নি, তাই কোনো সাড়াও দিইনি।

থাক, থাক, ঘুমুতে দাও ওকে। হ্যাঁ, তোমার সবগুলো অঙ্কই রাইট হয়েছে। থ্যাঙ্কস্। কিন্তু শুধু অঙ্ক শিখলেই তো হবে না। বাকী অন্যান্য বিষয়গুলিতেও সমান নম্বর রাখতে হবে, মনে থাকে যেন।

বারে, সব সাবজেক্টেই তো আমি ফার্ষ্ট। সে তুমি জানো না বুঝি? বাবা হয়ে তুমি সে খবর রাখো না—ছিঃ ছিঃ।

রাখি বৈকি। কিন্তু দেখলে তো কমল দেশের ইতিহাস সম্বন্ধে কি সুন্দর খোঁজখবর রাখে। দেশের অপমানের প্রতিশোধ নেবার জন্যে তার কি গভীর আগ্রহ। দেশকে ভালোবাসার এইতো লক্ষণ। এমনি দেশপ্রেমই আমি চাই সবার মধ্যে, তোমার মধ্যেও। বুঝলে তো তোমাদের কাছে আমি কি আশা করি?

ঠিক আছে, তোমার কমল যদি দেশপ্রেমে নেতাজী সুভাষচন্দ্র হয়ে বসে, আমি নিশ্চয়ই অন্ততঃ সুভাষচন্দ্রের দাদা শরৎচন্দ্র হবো। তা, হলে তুমি খুশি হবে তো?

ওয়াণ্ডারফুল, ওয়াণ্ডারফুল মাই ডিয়ার বয়।

বলে চীৎকার করে খাট থেকে লাফিয়ে পড়েন কেদারেশ্বরবাবু।

আর সেই ডাক শুনে 'কি হয়েছে, 'কি হয়েছে' বলতে বলতে ঘুম থেকে জেগে ওঠে নিজের ঘর থেকে বাবার ঘরে ছুটে আসে জেনারেল কমল।

ঠিক সেই সময়েই বেড টি আর বিস্কুট নিয়ে ট্রে হাতে বাচ্চু এসে হাজির সেখানে।

কমল ঐ সময়ে ওরকম হন্তদন্ত হয়ে হাজির হয়ে কেমন যেন একটু ভ্যাবাচেকা খেয়ে যায়। একটু অপ্রস্তুত অবস্থায় বলে ফেলে, আমি ভেবেছিলাম কি জানো বাবা?

কি ভেবেছিলে?

কেদারেশ্বরবাবু জিজ্ঞেস করেন।

ভেবেছিলাম পর্তুগীজ দস্যুরা বোধ হয় আমাদের বাড়ি আক্রমণ করেছে। তাদের সঙ্গে তুমি আমাকে লড়াই করতে দেখে 'ওয়াণ্ডারফুল, ওয়াণ্ডারফুল মাই ডিয়ার বয়' বলে আমায় 'চিয়ার আপ' করছো।

একথা শুনেই হো-হো করে হেসে ফেলেন কেদারেশ্বরবাবু। তারপর এক ঢোক চা গিলে নিয়ে বিস্কুট দু'খানা দু' ছেলের হাতে তুলে দিয়ে তাদের সঙ্গে গল্প জুড়ে দেন। ঠাট্টা করে নির্মলকে বলেন, তা' হলে দেখা যাচ্ছে এ যাত্রায় তোমার সেনাপতি ভাই-ই গোয়া যুদ্ধে বিজয়ী হচ্ছে।

তার মানে?

বাবার কথায় নিজের মনেই প্রশ্ন তোলে কমল। সঙ্গতভাবেই প্রশ্ন তোলে, এ যাত্রায় সে বিজয়ী হচ্ছে তার মানেটা কি? পর্তুগীজরা একবার হেরে গিয়ে আবার এসে হঠাৎ আক্রমণ করবে?

সেটি হচ্ছে না, কি বলো দাদা? এবারই একেবারে তল্পিতল্পা নিয়ে ও ব্যাটাদের চিরকালের মতো ভারতের সীমানা ছেড়ে পালাতে হবে।

তাই বুঝি?

নির্মলদা মুচকি হেসে টিপ্পনি কাটে। শুধু তাই নয়, হাসি-হাসি চোখে বাবার দিকে তাকায়।

হেসো না দাদা। তুমি বোধ হয় এ যুদ্ধের সিরিয়াসনেসটাই ধরতে পারোনি, তাই হাসছো। পরশু রাতেই তো আমরা দু'ভাই একসঙ্গে বসে আকাশবাণীর খবর শুনলাম, দমন এবং দিউ এরই মধ্যে আত্মসমর্পণ করেছে। এদিকে পাঞ্জিমের দরজাও চারদিক থেকেই ফাঁকা পেয়েছে ভারতীয় সৈন্যরা। আর কি চাই?

মহা উৎসাহে অনর্গল বলে চলে কমল। তারপর হঠাৎ দেয়াল ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে সে চেঁচিয়ে ওঠে, দাদা, রেডিওটা একটু খুলে দাও না, সাড়ে সাতটা বেজে গেছে যে। নিশ্চয়ই এখন গোয়া যুদ্ধের নিউজ রিলে হচ্ছে। এখনই হয়তো আমরা খবর পেয়ে যাবো কেল্লা ফতে হয়ে গেছে!

ঠিক তাই। নির্মল রেডিওটা ছাড়তেই গোয়া যুদ্ধের ধারা বিবরণী শুনতে পাওয়া গেল। জেনারেল কমল ঘটকের অনুমানও একেবারে পুরোপুরি ঠিক। পর্তুগীজ বাহিনীর অধিনায়ক আত্ম-সমর্পণ করায় আজ ১৯শে ডিসেম্বর 'গোয়া-দমন-দিউ'র সাড়ে চারশ' বছরের হার্মাদী শাসনের অবসান ঘটলো। এই সরকারী ঘোষণা শোনা মাত্রই জেনারেল কমল 'বন্দেমাতরম' ও 'জয়হিন্দ' বলে চীৎকার করে উঠলো এবং তার সঙ্গে সঙ্গে ক্যাপ্টেন বাচ্চু এবং নির্মলও। কেদারেশ্বরবাবুও বাদ গেলেন না। আর সে চীৎকার যথার্থই গগনভেদী চীৎকার যা শুনে আশপাশের বাড়িগুলি থেকেও ছেলেবুড়ো সবাই জয়ধ্বনি দিয়ে সারা পল্লী মুখরিত করে তুললো। মুক্তির আনন্দ এমনিভাবেই প্রকাশ পেয়ে থাকে।

রেডিওতে তখনো গোয়া যুদ্ধের বিজয় বার্তা ঘোষিত হয়ে চলেছে। কান পেতে শুনছে সবাই। বিশেষ করে জেনারেল কমল ঘটক একেবারে এক পায়ে দাঁড়িয়ে থেকে ঘোষণার প্রতিটি কথা যেন গিলে ফেলছে। কমল আরেকবার চীৎকার করে উঠলো:

শুনছো মা, মাত্র ছাব্বিশ ঘণ্টার যুদ্ধেই ভারতের বুক থেকে

পর্তুগীজ শাসনকে পুরোপুরি খতম করে দিয়েছি আমরা। ওদের এতকালের অধিকৃত অঞ্চলগুলিতে সর্বত্রই এখন আমাদের জাতীয় পতাকা কী সুন্দর পৎপৎ করে আকাশে উড়ছে।

এরই মধ্যে এক ফাঁকে কখন যে কমল তার নিজের সাজানো গোয়া রণাঙ্গনের বিভিন্ন ঘাঁটিতে গিয়ে এক একটি ক্ষুদে জাতীয় পতাকা বসিয়ে রেখে এসেছে কেউ তা' টের পায়নি এবং তা দেখাবার জন্যেই সে টেনে নিয়ে আসে তার বুচি পিসীকে সেই সাজানো রণাঙ্গনের সামনে। এনে বলে, দেখো পিসী, গোয়া দমন দিউ সব জায়গায় আমাদের জাতীয় পতাকাগুলি সুন্দর লাগছে এখন, তাই না ?

দাদা, এই শোনো, পাঞ্জিমের রাজপথে আমাদের বিজয়ী সেনাপতি জেনারেল জয়ন্ত চৌধুরীর বিপুল সম্বর্ধনার সংবাদ শোনো আকাশবাণীতে।

বেশ তো, আমরাও এখানে জেনারেল কমল ঘটকের বিরাট এক সম্বর্ধনার আয়োজন করছি।

এই বলে নির্মল হাঁকতে শুরু করে, কে কোথায় আছ, তোমরা সব এই সমাবেশে এসে হাজির হও। গোয়াযুদ্ধ-বিজয়ী জেনারেল কমল ঘটকের সম্বর্ধনা সভায় সবাইকে আহ্বান জানানো হচ্ছে। শৃঙ্খলারক্ষার দিকে সকলকে বিশেষ সতর্ক থাকতে হবে।

দুই ছেলের কাণ্ডকারখানা দেখে কেদারেশ্বরবাবু হেসে কুটপাট। গিন্নীকে ডেকে বলেন, তুমি বুঝতে পারছো না, কি রকম দুই রত্ন ছেলের মা হয়ে বসেছো তুমি।

ঠিক আছে, আমার বুঝে আর কাজ নেই। দুই রত্ন ছেলের বাপ বুঝতে পারলেই আমি খুশি।

গিন্নী এই ছোট্ট উত্তরটুকু দিয়ে চুপ করে যান।

এদিকে বাচ্চুকে দিয়ে দু'খানা চেয়ার আনিয়ে নিয়েছে নির্মল তার ছোট ভাইয়ের সাজানো রণাঙ্গনের সামনে। সেখানেই জেনারেল

ঘটকের সম্বর্ধনার আয়োজন হয়েছে। ছোটবোন বেলা, বুচি পিসী, বাবা, বাসন্তী ঝি এবং ওর মেয়ে পিয়ালী তো আছেই, তা'ছাড়া নির্মল আর কমলের পাড়ার কয়েকজন বন্ধুও ঠিক সেই সময়েই সেখানে এসে হাজির। নটা, ভুলু, ফেলা, পল্টু ওরা সব পাশাপাশি বাড়ির ছেলে। যখন তখন ওরা এবাড়ি-ওবাড়ি করে থাকে। কাজেই ওদের হাজিরার মধ্যে নতুনত্ব কিছু নেই। তবে আট-দশ মিনিটের পথ হেঁটে গোবিন্দ ঘোষমশাই যে না-জেনে শুনে সভাস্থলে এসে উপস্থিত হয়েছেন সেটাই আশ্চর্যের ব্যাপার।

বয়েসে অনেক ছোট হলেও কেদারেশ্বরবাবুকে খুবই পছন্দ ঘোষমশাইয়ের। ছেলে মানুষ করতে হলে এমনি মাষ্টারই চাই। সেই ধারণা থেকেই গোবিন্দ ঘোষ তাঁর মা-বাপ-মরা নাতি পল্টুকে কেদারেশ্বরবাবুর স্কুলে ভর্তি করিয়ে দিয়েছেন, তাঁর হাতেই তাকে সঁপে দিয়েছেন।

অসম্ভব রকমের দুষ্টু ছেলে পল্টু। সবাই বলতো, একে সংশোধন করা শিবেরও অসাধ্য। এর যা হবার হয়ে গেছে, আর কিছু করার নেই। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার গত এক বছরের মধ্যে সেই পল্টুরই অনেকটা পরিবর্তন ঘটেছে। তা' হলেও মাঝে মাঝে এমন এক একটা কাণ্ডকারখানা সে করে বসে যার জন্যে তার বুড়ো ঠাকুর্দাকে পর্যন্ত ছুটে আসতে হয় কেদারেশ্বরবাবুর কাছে নালিশ জানাতে।

এবারের আসাও গোবিন্দ ঘোষমশাইয়ের তাঁর ঠিক সেই একই কারণে, তবে এবার এসেছেন তিনি অপরাধী নাতিকে সঙ্গে নিয়ে।

গোবিন্দ ঘোষমশাই ভেতরে এসে ঢুকতেই তাঁর দিকে ছুটে যায় নির্মল। শহরের ও-এলাকার তিনি বিশেষ সম্মানিত প্রবীণতম ব্যক্তি, তাঁকে সাদর অভ্যর্থনা তো জানাতেই হবে। নির্মল নিজেই তাড়াতাড়ি আরেকখানা চেয়ার বার করে এনে বসতে দেন ঘোষমশাইকে।

কেদারেশ্বরবাবুর শিক্ষায়ই তাঁর দুই ছেলে এমনি সুন্দরভাবে তৈরি হয়েছে, এ দেখে গোবিন্দবাবু ভারি খুশি। সেই খুশিরই প্রকাশ ঘটে তাঁর কথায়।

ছেলে দুটি আপনার খুবই চমৎকার হয়েছে মাষ্টারমশাই। আমি যখনই আসি আপনাদের বাড়িতে তখনই ওদের মিষ্টি ব্যবহারে মুগ্ধ হয়ে যাই।

তা' সবই আপনাদের আশীর্বাদে।

জবাব দেন কেদারেশ্বরবাবু।

তবে কি আপনি বলতে চান, আমি কিছু কম আশীর্বাদ করি আমার নিজের নাতিটাকে। তা'হলে ওটা আপনার ছেলেদের মতো হলো না কেন?

কেন, কি হয়েছে? পল্টুর কথা বলছেন তো, দেখবেন ও কেমন ভালো ছেলে হয়ে যাবে আর কয়েকটা মাসের মধ্যে।

আপনার মুখে ফুল চন্দন পড়ুক মাষ্টারমশাই। বাড়ি থেকে পালিয়ে গিয়ে কাল সারাটা রাত আমাকে আর ওর ঠাকুমাকে কি কষ্ট যে ও দিয়েছে, সে আর কি বলবো। সারারাত আমরা দুই বুড়োবুড়ি জেগে বসে কাটিয়েছি।

ও নিয়ে আপনি কিছু ভাববেন না ঘোষমশাই। ছোটবেলায় সব নাতি-নাতনিই দাদা-দিদিকে এমনি ভুগিয়ে থাকে। আপনি তো জানেন না, আপনার নাতি পরীক্ষায় কি ফাইন রেজাল্ট করেছে এবার। মাত্র চারটি নম্বরের জন্যে সে সেকেণ্ড হয়ে গেছে। আরেকটু হলেই সে ফার্স্ট হয়ে যেতো। কালই রাত্রে আমি ওদের ক্লাসের সব খাতার নম্বর মিলিয়েছি। একবার যদি পল্টু ফার্স্ট হয়ে যায় তখন দেখবেন, কেউ আর ওকে রুখতে পারবে না। পড়ার আনন্দ সে পেতে আরম্ভ করেছে, কাজেই ওকে নিয়ে আর আপনাকে একটুও চিন্তা করতে হবে না।

বাঃ, তা'হলে আপনি মাস্টারমশাই আশা দিচ্ছেন, পল্টুও খুব ভালো ছেলে হয়ে যাবে।

শুধু লেখাপড়ায়ই ভালো নয়, যাকে সত্যিকারের ভালো ছেলে বলে তাই সে হবে—সে অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবে, দুর্বলের পক্ষ হ'য় লড়বে, বিপন্নের সাহায্যে এগিয়ে যাবে। তেমন সব ছেলেই তো দরকার, আমিও তেমন ছেলেই চাই।

ঘোষমশাইয়ের চোখমুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠছিল এসব আশার বাণী শুনে। আর একটু পেছনে দাঁড়িয়ে দাদু আর মাস্টারমশাইয়ের কথাবার্তা শুনতে পেয়ে মুচকে মুচকে হাসছিল পল্টু।

ঠিক সেই সময়েই নির্মল সেখানে দাঁড়িয়ে পড়ে হঠাৎ এক ঘোষণায় বললে, আমাদের খুব আনন্দের বিষয়, আজকের এই সম্বর্ধনা সভায় সর্বজনমান্য শ্রীগোবিন্দ ঘোষমহাশয় উপস্থিত আছেন, তিনিই এই সভায় পৌরোহিত্য করবেন।

এই ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গেই সমবেত হাততালি পড়লো।

ঘোষমশাই তো অবাক! এ আবার কি ব্যাপার, জিজ্ঞেস করলেন তিনি।

দেখুন না কি মজা! কেদারেশ্বরবাবুর এই জবাবে চুপ করেই থাকতে হয় সভাপতিকে। এমন জমজমাট ও গুরুগম্ভীর পরিবেশে তিনি কোনো কথা বলতে ভরসাই পেলেন না।

নির্মল তখন আবার বলতে শুরু করে। এবার তার বলবার বিষয় সভার লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য।

সে সম্বন্ধেই নির্মল বলে চলে, আজ ভারতের বড়ো আনন্দের দিন। কারণ গোটা ভারতই আজ স্বাধীন। ইংরেজ ও ফরাসীরা তাদের ভারতীয় উপনিবেশ স্বেচ্ছায়ই ছেড়ে গেছে। তার জন্যে কোনো যুদ্ধ-বিগ্রহের প্রয়োজন হয় নি। কিন্তু গোলমাল চলেছে পর্তুগীজ ভারতের মুরুব্বিদের নিয়ে। তারা বলে আসছে পর্তুগীজ

অধিকৃত ভারতীয় অংশ পর্তুগালেরই অংশ। একটু দম নিয়ে নির্মল আরো বলতে থাকে, কি অসম্ভব ধৃষ্টতা! অথচ একেবারে সেই শুরু থেকে অর্থাৎ ১৫১০ খ্রীষ্টাব্দে বিজাপুরের সুলতানের হাত থেকে গোয়া কেড়ে নেবার কয়েক বছরের মধ্যেই গোয়াবাসী ভারতীয়দের মধ্যে পর্তুগীজ শাসকদের বিরুদ্ধে যে বিদ্রোহ ধূমায়িত হয়ে উঠেছিল কখনো তা' সম্পূর্ণভাবে দমন করা পর্তুগালের পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠে নি, কম করে হলেও সশস্ত্র বিদ্রোহের আগুনে ভারতে পর্তুগীজ শাসনকে অন্ততঃ চল্লিশবার দগ্ধ হতে হয়েছে। সেখানে শেষ সশস্ত্র বিদ্রোহ ঘটেছে ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে এবং তারপর থেকে ক্রমাগত আন্দোলন চলে এসেছে স্বাধীনতার জন্যে, ভারতের মূল ভূখণ্ডের সঙ্গে যুক্ত হবার জন্যে।

এরপর আরো বললে নির্মল, কিন্তু কিছুতেই পর্তুগালের শিক্ষা হবার নয়। বিশেষ করে ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে পর্তুগালে একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিকারী হয়ে ডাঃ সালাজার এমনই উদ্ধত হয়ে উঠলেন যে, নির্লজ্জের মতো ঘোষণা করে বসলেন, ভারতে খ্রীষ্টধর্মের স্বার্থে গোয়ায় পর্তুগীজ শাসনকে অব্যাহত রাখতেই হবে। সালাজার এই ঘোষণার পর চুপ করে বসে থাকেন নি। সমখ্রীষ্টধর্মাবলম্বী দেশগুলিকে তিনি যেমন তাঁর দিকে টেনে নেবার জন্যে সব রকম কলাকৌশল বিস্তার করেছেন, তেমনি আবার পাকিস্তানের সঙ্গেও মিতালি পাতিয়েছেন। ভারতকে এবং গোয়ায় মুক্তিকামী ভারতীয়দের জব্দ করার জন্যে। ডাঃ সালাজারের সেই ঔদ্ধত্যের যোগ্য জবাব দিয়েছে স্বাধীন ভারত। সালাজারী গুণ্ডাবাজীর দাপটে গত ত্রিশ বছরে শুধু পর্তুগালের জনসাধারণই হাঁপিয়ে ওঠেনি, ভারতের পর্তুগীজ শাসিত অঞ্চলও অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল, যে অঞ্চল থেকে পর্তুগীজ শাসকদের আমরা গলাধাক্কা দিয়ে বার করে দিয়েছি। সাড়ে চারশ' বছর পর ছ' লক্ষাধিক লোকের গোয়া-দমন-দিউ আজ বিরাট

স্বাধীন ভারতের অঙ্গীভূত। এর চেয়ে আনন্দের আর কি থাকতে পারে?

এই প্রশ্ন তুলে উপসংহারে বললে নির্মল, সেই আনন্দ উৎসব পালন করতেই আমরা আজ এখানে মিলিত হয়েছি। গোয়ায় বিজয়ী সেনাপতি জেনারেল চৌধুরী বিপুলভাবে সম্বর্ধিত হয়েছেন। আমাদের এখানে জেনারেল চৌধুরীর মতোই গোয়া জয়ের পরিকল্পনা নিয়ে গভীর আগ্রহে এগিয়ে চলেছে জেনারেল কমল ঘটক। তার পরিকল্পিত গোয়া রণাঙ্গন আপনারা চোখের সামনেই দেখতে পাচ্ছেন। গোয়া বিজয়ের পর তাই আমরা তারও অর্থাৎ জেনারেল কমল ঘটকেরও সম্বর্ধনার আয়োজন করেছি এখানে।

এই বলেই জেনারেল কমল ঘটককে মাল্যভূষিত করলো নির্মল।

এবার জোর হাততালি পড়লো চারিদিকে।

সভাপতি ঘোষমশাইও বলে উঠলেন, বাঃ। তিনি আশীর্বাদ জানালেন কমলকে।

তারপর সভাপতির ভাষণে ঘোষমশাই নির্ভীক কণ্ঠে বললেন, সবই তো হলো, একে একে বিদেশীদের সবাইকেই তোমরা তাড়ালে। শেষ পর্যন্ত মারের চোটে সালাজারী গুণ্ডাশাহীও ভারতের মাটি থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। এ বাস্তবিকই বড়ো আনন্দের, তৃপ্তির কথা তবে এবার দেশের গুণ্ডাবাহিনীকে যদি তোমরা দমন করতে পার, সমস্ত অনাচার-অবিচারকে যদি এদেশ থেকে দূর করতে পার তা'হলেই তোমাদের বলবো বাহাদুর।

এখানেই বক্তৃতা শেষ করে সভাপতিমশাই জয়হিন্দ ধ্বনি তুলে বসে পড়লেন।

ঠিক বলেছেন ঘোষমশাই, ঠিক বলেছেন। এই বলে কেদারেশ্বর বাবু পুরো সমর্থন জানালেন সভাপতিকে। তাঁর সাহসিকতার জন্যে তিনি সাধুবাদও জানালেন তাঁকে।

সম্বর্ধনার উত্তরে জেনারেল ঘটক সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে বললে, সভাপতিমশাইয়ের উপদেশ আমরা মাথায় করে নিচ্ছি। পর্তুগীজ দস্যুদের যেমন ভাবে আমরা শায়েস্তা করেছি, যেমন ভাবে ওরা আমাদের হাতে 'হেরে ভূত' হয়ে গেছে, ঠিক তেমনি ভাবেই আমরা গোটা দেশের গুণ্ডাদের দমন করবো, সম্পূর্ণ ন্যায়ের শাসন এবং প্রীতির শাসন প্রতিষ্ঠা করবো আমাদের এই প্রিয় ভারতে। সেই উদ্দেশ্যে বিরাট এক বাহিনী আমরা গড়ে তুলবো, তাতে পল্টুও থাকবে আমাদের সঙ্গে। সভাপতিমশাইকে আমরা দেখিয়ে দেবো, আমরা ছেলেরা ইচ্ছে করলে দেশকে কতো সুন্দর করে গড়ে তুলতে পারি।

এটুকু বলেই বসে পড়ে কমল এবং সঙ্গে সঙ্গেই সে কি হাততালি! একদম থামে না যেন!

স্বাধীন গোয়া, স্বাধীন ভারত জিন্দাবাদ! এমনি সব ধ্বনির মধ্যে সভা ভঙ্গ হলে ঘোষমশাই দাঁড়িয়ে উঠে বললেন কেদারেশ্বর বাবুকে, আপনার নির্মল-কমলের মতো ছেলেই তো আজকের দিনে প্রয়োজন আমাদের দেশে। আমাদের পল্টুও যদি ওদের সঙ্গে ভিড়ে যায় ভালোই হবে। আপনি পল্টুকেও নির্মল-কমলের মতোই করে দিন মাস্টারবাবু!

বেশ তাই হবে, বলেই কেদারেশ্বরবাবু ঘোষমশাইকে সঙ্গে নিয়ে ঢুকে পড়লেন তাঁর বৈঠকখানায়। সেখানে গল্প করতে করতে একটু চা-জলখাবার খেয়ে গোবিন্দবাবু বিদায় নিলেন নাতিকে নিয়ে। যেতে যেতে পথে কেবলি তিনি ভাবছিলেন গোয়া উদ্ধার দিবসের অভিনব অভিজ্ঞতার কথা।

অসংখ্য ভারতীয় জাতীয় পতাকা গোয়া বিজয় স্মরণে তখন পৎ পৎ করে উড়ছিল সারা ভারতে। দিকে দিকে।